স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা

৭৭ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ২৮ এপ্রিল, ২০২৫।। ১৪ বৈশাখ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

১০০

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ১৪ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৮ এপ্রিল - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,
Website : www.eswastika.com

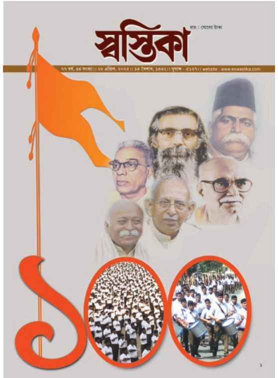

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

বহিরাগত জঙ্গি নিয়ে খেলার মাশুল গুনতেই হবে ‘পুলিশমন্ত্রী’ মমতাকে : শাক দিয়ে মাছ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদির ওয়াকফ ইতিহাস জানলে চোখে জল এসে যাবে
◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

সঙ্ঘ শাখা অর্থাৎ সেবাযজ্ঞ ◻ মধুভাই কুলকর্ণী ◻ ৮

বিশ্বায়নের সুফল-কুফল দুই-ই ভোগ করছে আমেরিকা
◻ কৌটিল্য ◻ ১০

সঙ্ঘ শতবর্ষে পঞ্চপণের একটি নাগরিক শিষ্টাচার
◻ সুব্রত ভৌমিক ◻ ১১

সমাজ পরিবর্তনে সঙ্ঘের বিবিধ সংগঠনের ভূমিকা
◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৩

সুস্থ ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে আরোগ্য ভারতী
◻ অঙ্কিতা সুর ◻ ১৫

প্রবুদ্ধ মননে সংস্কার সাধনে লোকপ্রজ্ঞার অগ্রগতি
◻ প্রফেসর (ড.) সোমশুভ্র গুপ্ত ◻ ১৬

হিন্দুত্বের মূল্যবোধে অক্ষয় তৃতীয়া উদ্‌যাপন
◻ প্রদীপ মারিক ◻ ৩১

সংস্কৃত আমাদের নিজের ঘরের সম্পদ
◻ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ◻ ৩৩

খেলার মাধ্যমে রাষ্ট্রনির্মাণে ব্রতী ক্রীড়া ভারতী
◻ জয়ন্তী মণ্ডল সরকার ◻ ৩৫

শিল্পীমনে রাষ্ট্রীয়তার বোধ জাগরণে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ
◻ সুভাষ ভট্টাচার্য ◻ ৩৮

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রারম্ভিক ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ : পর্ব-১
◻ প্রণয় রায় ◻ ৪৩

ত্রিপুরার শ্রমিক কর্মচারীদের নতুন দিশা দেখাচ্ছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ৪৬

দুর্গত মানুষের সেবায় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি
◻ জীবনময় বসু ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৫ মে
২০২৫

প্রকাশিত হবে
৫ মে
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জেহাদিদের কবলে পশ্চিমবঙ্গ

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন হোক বা ওয়াকফ সংশোধনী আইন— বিরোধিতার নামে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলেছে বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, হত্যা এবং সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস। ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা এতটাই তীব্র যে পাকিস্তান বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও প্রাণ বাঁচাতে ঘর-বাড়ি ফেলে সুরক্ষিত স্থানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। পুলিশ নির্বিকার। উলটে শাসক দলের মদত পাচ্ছে এইসব জেহাদিরা। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments from -

A Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অকৃত্রিম ভালোবাসা

পূর্ব সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দেশভক্তিতে জারিত স্বয়ংসেবকগণ দেশকে পরম বৈভবশালী করিবার লক্ষ্যে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিয়াছেন। রাষ্ট্রভক্তিতে ভরপুর স্বয়ংসেবকগণ সেই সেই সংগঠনের দ্বারা সমাজজীবনকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করিতে শুধু সক্ষমই হন নাই, সর্ম্পূ ভাবে সফলও হইয়াছেন। এই সফলতার চাবিকাঠি হইল সমাজের প্রতি তাঁহাদিগের অকৃত্রিম ভালোবাসা। রাষ্ট্রদেবতাকেই তাঁহারা আরাধ্য মনে করিয়াছেন, অন্য কিছুকে নয়। ছাত্র সমাজের অবক্ষয় দেখিয়া হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল স্বয়ংসেবক বলরাজ মধোক ও যশোবন্তরাও কেলকরের। জ্ঞান-চরিত্র-একতার মন্ত্রে ছাত্র সমাজেকে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ স্থাপনা করিয়াছেন। আজ তাহা দেশের সর্ববৃহৎ সংগঠনের রূপ ধারণ করিয়া ছাত্রশক্তি রাষ্ট্রশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। জনজাতি সমাজের দুঃখ, দারিদ্র্য, বঞ্চনা এবং তাহাদিগকে খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা ধর্মান্তরিত হইতে দেখিয়া তাহার প্রতিকারকল্পে কার্যকর্তা উমাকান্ত কেশব দেশপাণ্ডে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেবা, সংস্কার, স্বাবলম্বন ও স্বাভিমানকে মন্ত্র করিয়া তিনি জনজাতি সমাজের হৃদয় জয় করিয়া তাহাদের উত্থান ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছেন। হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে ভেদভাব নির্মূল করিবার লক্ষ্যে সাধুসন্তদের সঙ্গে লইয়া দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্থাপনা করিয়া সঙ্ঘ কার্যকর্তা দাদাসাহেব আপটেকে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন। প্রখর সংগঠন কুশলতার কারণে তিনি এই সংগঠনের বিশ্বব্যাপী বিস্তার ঘটাইয়াছেন। শ্রমিক সমাজকে রাষ্ট্রভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিবার লক্ষ্যে শ্রমিকদের জন্য ও শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সঙ্ঘের প্রখর চিন্তাবিদ দত্তোপন্ত ঠেংড়ী। এই সংগঠনও আজ দেশের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন হিসাবে পরিগণিত। দেশের কৃষকদের সম্পূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন দত্তোপন্ত ঠেংড়ী। অর্থনৈতিকভাবে দেশকে আত্মনির্ভর করিবার লক্ষ্যে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চও স্থাপনা করিয়াছেন তিনি। শিক্ষাক্ষেত্রে নবীন প্রজন্মকে ভারতীয় সংস্কৃতিভিত্তিক শিক্ষাদান ও সংস্কার প্রদানের লক্ষ্যে কয়েকজন কার্যকর্তা বিদ্যা ভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আজ এই সংগঠন দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি শিক্ষা সংস্থা রূপে পরিগণিত। সমবায় ক্ষেত্রকে জনকল্যাণকারী স্বরূপ প্রদানের লক্ষ্যে এবং আর্থিক সেবা দ্বারা সমাজের উত্থানের জন্য অভিজ্ঞ কার্যকর্তা লক্ষ্মণরাও ইনামদার সহকার ভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এমনইভাবে এক-একজন কুশল কার্যকর্তা সমাজের উত্থানের নিমিত্ত এক-একটি ক্ষেত্রে কার্য শুরু করিয়াছেন। দীর্ঘ পরাধীনতার কারণে সমাজজীবনকে যে গ্লানি গ্রাস করিয়াছিল, তাহা বিদূরিত করিয়া রাষ্ট্রজীবনকে উন্নততর করিবার লক্ষ্যেই স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তাদের এই নিরলস প্রয়াস।

ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে রাষ্ট্রজীবনের পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত এই সংগঠনগুলি বহুবার বিজাতীয় মানসিকতার রোষের শিকার হইয়াছে। পদে পদে তাহাদের প্রশাসনিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রসেবায় নিরত রহিয়াছে। শতবর্ষব্যাপী সাধনায় সমগ্র সমাজ স্বয়ংসেবকদের পার্শ্বে রহিয়াছে। উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, দেশের সেবার লক্ষ্যেই যে রাজনীতি — তাহার রূপায়ণেও স্বয়ংসেবকগণ সফল হইয়াছেন। স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি আজ দেশে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল শুধু নহে, দেশের সেবা করিবার দায়িত্বও তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন। স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত ভারতের অগ্রগতি বিশ্ববাসীর আজ বিস্ময়ের বিষয়। আজ দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অধিকাংশ রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীগণ স্বয়ংসেবক অথবা স্বয়ংসেবক পরিবার হইতে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। এতদ্সত্ত্বেও দেশের ভিতরে-বাহিরে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয়। তাই সঙ্ঘের শতবর্ষে রাষ্ট্রকে পরম বৈভবের পথে লইয়া যাইতে স্বয়ংসেবকগণ অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ২০২৫ বিজয়াদশমী হইতে ২০২৬ বিজয়াদশমী পর্যন্ত স্বয়ংসেবকগণ সঙ্ঘের কার্যবিস্তার, কার্যকর্তার গুণবর্ধন, পঞ্চ পরিবর্তন, বিমর্শ নির্মাণ এবং সজ্জনশক্তির জাগরণে ব্যাপৃত থাকিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

সুভাষিতম্

লক্ষ্মীর্বসতি জিহ্বাগ্রে জিহ্বাগ্রে মিত্রশত্রবঃ।
জিহ্বাগ্রে বন্ধমোক্ষৌ চ জিহ্বাগ্রে মরণং ধ্রুবম্।।

জিহ্বার অগ্রভাগে লক্ষ্মী বাস করেন। শত্রু-মিত্রও জিহ্বার অগ্রভাগে বাস করে। বন্ধন ও মোক্ষও জিহ্বার অগ্রভাগে বাস করে এবং একথা সত্য যে মৃত্যুও জিহ্বার অগ্রভাগেই বাস করে।

বহিরাগত জঙ্গি নিয়ে খেলার মাশুল গুনতেই হবে 'পুলিশমন্ত্রী' মমতাকে

শাক দিয়ে মাছ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে তা ভালো কেউ জানেন না। ১৪ বছর ধরে তাঁর দল ও প্রশাসন বহু কুকীর্তির কারিগর। সেই সব কেলেঙ্কারি ঢাকতে গিয়ে তিনি প্রতিবার ফেঁসেছেন। এটা দুর্ভাগ্যের যে, রাজ্যের প্রায় ৪৬ শতাংশ ভোটার মমতার সমর্থক এবং বাকি ৫৪ শতাংশ মমতাকে সমর্থন না করলেও তাঁরা একজোট নন। অধিকাংশ ভোটার মমতার সমর্থক না হলেও বিরোধী ভোট বিভাজনের অঙ্কে ২০২১ ও ২০২৪-এর নির্বাচনে লাভবান হন মমতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোট বিজেপির পক্ষে একত্রিত না হওয়ার কারণে নির্বাচনে জয়ী হয় তৃণমূল, মান্যতা পেয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর যাবতীয় কুকীর্তি। একটি শিশুও জানে মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদে কারা হিন্দুদের আক্রমণ করছে এবং পুলিশ কেন তাদের আটকায়নি। মমতা মুসলমান ভোটের জোরে আর হিন্দু ভোটের ভাগাভাগিতে জেতেন। মুসলমান ভোটের অধিকাংশ এবং হিন্দু ভোটের কিয়দংশ একজোট হয়ে মমতার কুকীর্তিকে মান্যতা দেয়। মুসলমানদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি হয়েও হিন্দুরা একজোট হয়ে বিজেপিকে ভোট দেন না। ফলে বার বার মমতার কুকীর্তি চাপা পড়ে যায়।

মুর্শিদাবাদে হিন্দুহত্যার ঘটনা চাপা দিতে বহিরাগত জঙ্গি তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে সামাজিক সংগঠনকেও জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে নানা মিথ্যে অভিযোগ করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড় আর কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করে, মমতাও তাই করছেন। মমতার নৌকো ডুবেও ডোবে না। রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি যা খুশি বলতে ও করতে পারেন। তার দল ও সরকারের সব অন্যায় ঢাকতে মমতা চিরকাল পারদর্শী, বিশেষত তিনি যদি নিজেও তাতে যুক্ত থাকেন। বিদেশি বাম জমানায় কংগ্রেস ভেঙে দল গড়ার সময় বহুবার তিনি গল্পের গোরু গাছে তুলেছেন। বিদেশি বামেদের কোনোদিন সরাতে পারবেন এমন বিশ্বাস মমতার ছিল বলে মনে হয় না। কয়েকটি নির্বাচনের ফল তার ইঙ্গিত দিয়েছিল। মমতা যেমন ভাবতে পারছিলেন না তিনি বামেদের সরিয়ে কোনোদিন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসবেন, বিদেশি বামেরাও ভাবেনি তারা মমতার কাছে হেরে যাবে। বিদেশি বামেরা রাজ্য কংগ্রেসকে পকেটে পুরে ফেলেছিল। বলা হতো জ্যোতি বসু দু'টো দল চালান— রাজ্য কংগ্রেস আর সিপিএম। ১৯৭৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত জ্যোতি বসুর তৈরি কংগ্রেস-সিপিএমের জাঁতাকলে মানাতে না পেরে ২০১১-তে কাটা পড়েন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু তাতে মমতার কোনো কৃতিত্ব ছিল না।

অনেকেই মানবেন না যে, ২০১১ সালে কেবল মমতার জোরে তৃণমূল জেতেনি। সোজাসাপটা বলি যে, ইদানীং রাজনীতি থেকে বসে যাওয়া মুকুল রায় আর বর্তমান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাতযশে তৃণমূল জিতেছিল। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ন'টি জেলা শুভেন্দুবাবু একা সামলাতেন। ঠিক একইরকমভাবে ১২১টির মধ্যে ১১৫টি পৌরসভার বোর্ড এবং সিপিএমের পুলিশকে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ভেঙেছিলেন মুকুল রায় ও শুভেন্দুবাবু। তাই এখন মমতার প্রকৃত ভয় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। সেই সময় রাজ্যের ৫৭ হাজার বুথে কর্মী দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না তৃণমূলের। তাদের হয়ে কাজ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার অধীনস্থ বিক্ষুব্ধ পুলিশ। তারাই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পথ দেখিয়ে বিদেশি বাম দুষ্কৃতী, হার্মাদ ও বুথ লুটেরাদের রিগিং ও জাল ভোট আটকে দেয়।

মমতা তা জানেন বলেই পুলিশকে কোনোভাবে হাতছাড়া করেন না। জামিনে থাকা অফিসারকে পুলিশের সর্বোচ্চ পদে বসিয়ে রাখেন। তার জন্য যদি মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রীর আসন থেকে নেমে 'পুলিশকর্মী' সাজতে হয়, তাও তিনি মেনে নেবেন। মমতা মুসলমান ভোটকে দাবার বোড়ে মনে করেন। পাশাপাশি পুলিশের হয়ে সাফাই দিতে 'পুলিশকর্মী' সাজতে মমতা রাজি। তার মতে বাইরে থেকে জঙ্গি এসে মুর্শিদাবাদে হিন্দু হত্যা ও আক্রমণের ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। 'বাইরে থেকে' অর্থ কী? বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, আফগানিস্তান, নাকি অন্য কোনো সার্কভুক্ত দেশ থেকে?

সত্যিই হাস্যকর লাগছে। নজর ঘোরাতে মমতা সম্প্রীতি ও মুসলমান তোষণের ভাষা একসঙ্গে বলেন। মমতার কাছে বহিরাগত জঙ্গি গণ্ডগোল বাধিয়ে পালিয়ে গিয়েছে মানেই স্থানীয় দুধেল গাইয়েরা, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের আসল অপরাধীরা কোনোদিনই ধরা পড়বে না। রাজ্য প্রশাসনের উসকানি আর প্রত্যক্ষ মদতেই ওয়াকফ আইনকে সামনে রেখে যারা হিন্দু হত্যা করেছে, তাদের তিনজন ধরা পড়লেও, কোন জেহাদিদের উসকানিতে হিন্দুদের বাড়ি ও সম্পত্তি আক্রান্ত হলো তা হয়তো কোনোদিন জানা যাবে না। 'পুলিশমন্ত্রী' মমতা তা জানতে দেবেন না। তবে এভাবে আর কতদিন? ২০২৬-এর ভোটে সে সত্য প্রকাশিত হবে। সেটাই এখন দেখার।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিদির ওয়াকফ ইতিহাস জানলে চোখে জল এসে যাবে

ডিগবাজিপটীয়সীষু দিদি,

আপনি কিন্তু ওয়াকফ নিয়ে ডিগবাজি খেয়েছেন। আগের মমতা আর আজকের মমতা কিন্তু এক নয় দিদি।

কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ আইন সংশোধনী নিয়ে খুব রাগ দেখাচ্ছেন। কারণ, সেটা বিজেপি সরকার তথা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে হয়েছে। রাগ দেখানোই উচিত। তবে দিদি আপনি বারবার বদলে যান। এক সময়ে অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হয়েছেন। এখন শব্দটা শুনলেই রেগে যান। আবার এক সময় আপনি সচিত্র পরিচয়পত্র, ইভিএম-এ ভোট— এ সব চেয়েছেন। এখন আপনি ব্যালটপন্থী।

তেমনই দিদি ক্ষমতায় আসার পরে ওয়াকফ দুর্নীতি নিয়ে সিবিআই তদন্ত চেয়েছিলেন তো! সিআইডি তদন্তও হয়েছিল। এখন আপনি উলটো গাইছেন। দিদি, মনে পড়ছে, ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেই চেয়েছিলেন বাম আমলে ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির তদন্ত করুক সিবিআই। সেই আর্জি জানিয়ে ওই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে টানা তিন বছরে দফায় দফায় নথিপত্র পাঠায় নবান্ন। কিন্তু রাজ্যের পাঠানো সমস্ত নথি পরীক্ষা করে সিবিআই সাড়া দেয়নি। মনে রাখতে হবে সেই সময়ে কেন্দ্রে আপনার বন্ধু সরকার। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। তার পরে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে সিবিআই জানিয়ে দেয়, তারা এই তদন্ত-ভার নিতে পারছে না।

তারও আগে ১৯৯৬ সালের কথা বলি। দিদি আপনি তখন দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেস সাংসদ। সেই সময়ে আপনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লিখে পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সম্পত্তি নয়ছয়ের অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তৎকালীন বাজারদর অনুযায়ী এক হাজার কোটি টাকা মূল্যের ১৬০টি ওয়াকফ সম্পত্তি লিজ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর অনিয়ম হয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ ছিল। আপনার চিঠির জন্যই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি গীতেশরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠন হয়। বিচারপতি ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন কমিশন ২০০১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়ে আপনার অভিযোগেই সিলমোহর দিয়েছিল।

পরে সিআইডি দিয়ে তদন্ত শুরু হয়। সেই সময়ে রাজ্য সরকার মূলত বলতে চেয়েছিল উলুবেড়িয়ার প্রাক্তন সাংসদ, সিপিএমের নেতা হান্নান মোল্লা ওয়াকফ সম্পত্তি ভোগ করছেন। অভিযোগ ছিল বিধানসভার তৎকালীন স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিমের বিরুদ্ধেও। কিন্তু পরে আপনি জানতে পারেন তৃণমূলের অনেক নেতাই ওয়াকফ সম্পত্তির দখলদার। লাটে ওঠে রাজ্য সরকারের তদন্ত।

সদ্য প্রয়াত নাসিরুদ্দিন আহমেদ নদীয়ার কালীগঞ্জের এই বিধায়ক ওয়াকফ বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। কৃষ্ণনগরে 'সাহিবুল্লা ওয়াকফ এস্টেটে' ৩ হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাট তিনি 'জবরদখল' করেছিলেন। ওয়াকফ বোর্ডের অপর সদস্য এখন আপনার দলের রাজ্যসভা সাংসদ নাদিমুল হক। ওয়াকফের ২২ কাঠা জমি তিনিও 'কবজা' করেছেন।

> **সবচেয়ে বেশি অভিযোগ কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে। জোহুরা বিবি ওয়াকফ এস্টেটের ৩৫ বিঘা জমির মধ্যে ফিরহাদ হাকিম ৫ বিঘার বেশি জমি জবরদখল করে মার্বেল পাথরের শোরুম চালাচ্ছেন।**

সবচেয়ে বেশি অভিযোগ কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে। জোহুরা বিবি ওয়াকফ এস্টেটের ৩৫ বিঘা জমির মধ্যে ফিরহাদ হাকিম ৫ বিঘার বেশি জমি জবরদখল করে মার্বেল পাথরের শোরুম চালাচ্ছেন। আবার কলকাতা পুরসভার ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শাম্মি জাহান বেগম টিপু সুলতান গোরস্থানে জমি 'জবরদখল' করে রেখেছেন।

মেটিয়াবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের দান করা ওয়াকফ সম্পত্তিও 'জবরদখল' হয়েছে। ২০২০ সালে হুমায়ুন আলি মির্জা নামে ট্রাস্টের এক সদস্য অন্য সদস্যদের মতামত না নিয়েই নতুন 'ট্রাস্ট ডিড' (দলিল) তৈরি করে ওই জমি একটি নবগঠিত হাসপাতাল ট্রাস্টকে 'সাব-লিজ' দিয়ে দেয়। সেই হাসপাতাল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম। আফাকুজ্জামান নামে ওয়াকফ বোর্ডের আর এক সদস্য হলেন ফিরহাদের ঘনিষ্ঠ। আফাকুজ্জামান 'অবৈধ' ভাবে ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য হয়েছেন।

আরও একটা কথা দিদি। কেন্দ্রীয় সরকার নতুন ওয়াকফ আইনে ওয়াকফ বোর্ডে কয়েকজন অমুসলমান সদস্যের অন্তর্ভুক্তির সংস্থান রেখেছে। কিন্তু দিদি, পশ্চিমবঙ্গেই জলপাইগুড়ি জেলার সরবত আলি মুহাম্মদ ওয়াকফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লি কমিটিতে সভাপতি করা হয়েছিল জনৈক সুধীররঞ্জন ধারাকে এবং কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছিল জনৈক শঙ্করপ্রসাদ সেনকে।

আপনার বিরোধিতাকে আমি সমর্থন করছি। সেটা অনুগত ভাই হিসেবে। কিন্তু এসব জানার পরে না আমার কেমন যেন আপনার ডিগবাজি ভূমিকা নিয়ে হিসাব গুলিয়ে যাচ্ছে। □

অতিথি কলম

মধুভাই কুলকর্ণী

সঙ্ঘ শাখা অর্থাৎ সেবাযজ্ঞ

রাষ্ট্র কী? এর জ্ঞান ছাড়া রাষ্ট্রভক্তি তৈরি হতে পারে না। রাষ্ট্রভক্তির ভাবনা ব্যতিরেকে স্বার্থের অঞ্জলি দিয়ে রাষ্ট্রের জন্য পরিশ্রম করা সম্ভব নয়।

যদি কেউ আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানে চড়তে চায় তবে তার প্রথমটিই হলো সেবা। সেবাভাব প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই জন্মগত একটি বৈশিষ্ট। যিনি সেবা করে থাকেন তার তুলনা মায়ের সঙ্গে করা হয়। যদি কোনো কাজ মায়ের সেবা মনে করে করা হয় তবে তা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়। যদি কোনো কাজ ভগবানের সেবা মনে করে করা হয় তবে সেই সেবাব্রতী সেই কাজে কেবল উৎকর্ষতা লাভ করে না বরং যে রকম আনন্দ প্রাপ্তি ঘটে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এভাবে কাজ করার কারণে অহংকার তাকে স্পর্শ করতে পারে না। প্রতিটি কাজকে ঈশ্বরীয় কাজ মনে করে করলে আমাদের মানসিক অবস্থাও ঠিক তেমনই হবে। সন্ত জ্ঞানেশ্বর মহারাজ তাঁর এক অভঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

পরি হে মিয়া কেলে।
কী হে মাঝেনি সিদ্ধী গেলে।
ঐসে নাহি ঠেবিলে। বাসনেমাজী।

অর্থাৎ, 'আমি এটা করেছি অথবা আমার কারণে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, এমন কামনা-বাসনার অহংকার যেন আমার মনে স্থান না পায়।' আমরা আমাদের চারপাশে এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যাঁরা তাদের সম্পূর্ণ জীবন সেবা কাজের জন্য সমর্পিত করেছেন। যেমন, বঙ্গপ্রদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি শান্তি নিকেতনের নামে শিক্ষার আদর্শ কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। বাবা আমটে, যিনি কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটি বিখ্যাত সেবাকেন্দ্র আনন্দবন গড়ে তুলেছেন। পূজ্য নারায়ণ গুরু, যিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিকগুলির মাধ্যমে শোষিত, পীড়িত, বঞ্চিতদের উত্থানের জন্য কাজ করেছেন। ডাঃ ভীমরাও গস্তী, যিনি কর্ণাটকের বেলগাভীতে একটা কেন্দ্র স্থাপন করে বেরড সমাজের বিকাশের জন্য নিজের জীবন সমর্পণ করেছেন। গুজরাটের জলারাম বাপু একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সন্ত ছিলেন। তাঁর আশ্রমে অখণ্ড ভাণ্ডারা চলে। দেশের প্রতিটি স্থানেই এমন আদর্শ আমরা দেখতে পাই। একবার ব্যক্তির মনের মধ্যে সহানুভূতি জাগ্রত হলে সে হাজারো সেবাকাজ সমাজের জন্য করতে পারে। দিব্যাঙ্গ, মানসিক প্রতিবন্ধী, উপেক্ষিত, অন্ধ, অনাথ প্রভৃতি ব্যক্তি নিজের সেবার জন্য কাউকে ডাকে না। তাদের জন্য আজ প্রচুর সংগঠনকে কাজ করতে দেখা যায়। অন্নদানকে পুণ্যকর্ম মনে করে পাঠরত ছাত্রদের জন্য কোনো রকম ভেদাভেদ না করে সকলের জন্য অন্নদানের জন্য ধর্মীয় সংস্থাও রয়েছে। গুরুদ্বারা লঙ্গরের জন্য বিখ্যাত। ছাত্রাবাস, বালক সংস্কার কেন্দ্র, বৃদ্ধাশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি সেবার মানসিকতায় চালানো হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের থেকে প্রেরণা নিয়ে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে জনজাতি সমাজকে বেছে নিয়েছে। তারা অজস্র সেবাকাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদও এমনই সেবা সংগঠন। দূরদূরান্তের ছোটো ছোটো গ্রামে এক শিক্ষকের বিদ্যালয় হাজার হাজার স্থানে চলছে।

ডাক্তারজীর জন্ম শতবর্ষে অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে সঙ্ঘ স্বাধীনভাবে একটি সেবা বিভাগ শুরু করে। তাতে অখিল ভারতীয় স্তর থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত সেবা সংযোজক নিযুক্ত করা হয়। স্বয়ংসেবকদের দ্বারা চালিত সমস্ত সেবাকাজ সেবা ভারতীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গরিব দুঃখীর দুঃখ দূর করার প্রচেষ্টা একটি আবশ্যক সেবা কাজ। সন্ত তুকারাম অন্য একটি অভঙ্গে বলেছেন—

জে কা রঞ্জলে গাঞ্জলে।
ত্যাসি মহণজে জো আপুলে।
তোচি সাধু ওড়খাবা।
দেব তেথেচি জাণাবা।

অর্থাৎ, 'যারা পরিস্থিতি ও পার্থিব আবেগের ভারে ভারাক্রান্ত, তাদেরও যাঁরা আপনার জন বলে মনে করেন, তাঁদেরই প্রকৃত সাধু হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। ঈশ্বর সত্যিই তাঁদের মধ্যে বাস করেন।'

ভদ্রতা বা নম্রতা মানবতার প্রতীক। এমন সেবাকাজের জন্য আর্থিক সহযোগিতা সবসময়ই জুটে যায়। অখণ্ড ভাণ্ডারা বা অন্নসত্র চালানো ধর্মীয় সংস্থাগুলোর কখনো খাদ্যান্নের অভাব হয় না। এই ধরনের সেবাকাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নিজেদের জন্য এক ভিন্নধর্মী বুনিয়াদি সেবাকাজ নিশ্চিত করেছে। শুধুমাত্র সংগঠিত সমাজই সফলতার সঙ্গে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে, এজন্যই হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হিন্দু সংগঠনের কথা বললেই কিছু লোকের ভ্রূ কুঁচকে যায়। তাহলে মুসলমানদের কী হবে, এমন চিন্তা তাদের মাথায় আসে। যেন মুসলমানদের ছাড়া হিন্দু সংগঠন অর্থহীন। এ ধরনের লোকেরা বোঝে না 'হিন্দু সংগঠন' শব্দের

গভীরতা এবং তার ব্যাপক পরিধি। হিন্দু সংগঠন মানে (ক) পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ। (খ) সব রকমের ভেদাভেদমুক্ত সমাজ। (গ) অনৈতিকতা ও অস্পৃশ্যতামুক্ত সমাজ। (ঘ) ভ্রষ্টাচারমুক্ত চরিত্রবান সমাজ। (ঙ) সমাজকেই ঈশ্বর মনে করে এবং মানব সেবাকেই ঈশ্বরের সেবা মনে করা সমাজ।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, হিন্দু সংগঠনের ভাবনা সময় অনুসারে বিস্তার ঘটতে থাকবে। হিন্দু সমাজকে ভারতে তথা বিশ্বে গৌরবপূর্ণ স্থান পাওয়াই উচিত। পূজনীয় ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর ব্যক্ত কিছু ভাবনাকে বোঝার চেষ্টা করলে দেখা যায়, সঙ্ঘের দ্বারা নির্ধারিত গঠনমূলক সেবাকার্য অর্থাৎ হিন্দু সংগঠনের কাজের পরিধি কত বিশাল এবং গভীরতাও কত ব্যাপক।

ডাক্তারজী বলতেন, 'কোন দেশ কতটা মহান তা নির্ভর করে সেই দেশের অধিবাসীদের মহানতার উপর। সমগ্র রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি এর উপরই নির্ভর করে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের জন্য রুচি, আবেগ ও ইচ্ছা নির্মাণ করাই আমাদের সাধনা। এটিই আমাদের বৈশিষ্ট্য এবং এটিই আমাদের সফলতার চাবিকাঠি।

পূজনীয় শ্রীগুরুজীর মতে সমাজের জীবনীশক্তিকে বিনষ্টকারী মতভেদ ও সংঘর্ষকে দূর করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ নির্মাণ করা আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। একটি সুব্যবস্থিত সমাজই অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সমর্থ। সেকারণে আমরা এমন ব্যক্তি যারা স্বদেশ প্রেমে ভরপুর, পরস্পরের সুখে-দুঃখে সহানুভূতি সম্পন্ন, সকলের সঙ্গে আন্তরিকতা ও আত্মীয়তার ভাব রাখেন এবং পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁদের চয়ন করা আমাদের কাজ ও কর্তব্য। আমাদের কাছে এই ভূমির চেয়ে পবিত্র আর কিছুই নেই। এই ভূমির প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি জড় ও চেতন বস্তু, প্রতিটি পাথর, প্রতিটি কাঠ, প্রতিটি বৃক্ষ ও নদী আমাদের কাছে পবিত্র। এই ভূমির প্রতিটি ব্যক্তির মনে তীব্র দেশভক্তি সর্বদা বিরাজ করুক এমনটাই সঙ্ঘ চায়। তিনি বলতেন, আসুন, আমরা আমাদের জীবনশৈলীর পথ কেবল আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের দ্বারা পরীক্ষিত শাশ্বত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত করি।

সঙ্ঘ শাখা সর্বদাই এই চেষ্টাই করে থাকে যে, ভাবনা যেন কেবল ভাবনাই না থাকে, সেই মতো যেন আচরণও করা হয়। সঙ্ঘ শাখা চালানো একটি স্বতন্ত্র মহৎ সেবাকাজ। এটিই বাকি সমস্ত সেবাকাজের আধারভূত সেবা কাজ, একটি অভিনব ও ব্যাপক সৃজনশীল কাজ। সঙ্ঘ মনে করে মুখ্যশিক্ষকের দক্ষতা অর্জন করে প্রতিদিন তিন-চারঘণ্টা সময় দিয়ে একটি ভালো শাখা দাঁড় করানো খুব বড়ো মাপের দেশসেবা। এটি শান্তিশৃঙ্খলার সঙ্গে নিয়মিত চলা কাজ। এতে প্রচার করার মতো কিছুই নেই। এই ভারতে হিন্দু সমাজে আমাদের জন্ম হয়েছে এটা আমাদের সৌভাগ্যের। হিন্দু সমাজ দোষমুক্ত, সংগঠিত, পূর্ণরূপে সক্ষম, বৈভবশালী হোক, তার জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। এই ভাবনাতেই মুখ্যশিক্ষক ও তার সহযোগীরা কাজ করেন। কোনো ফুলের মালা নয়, কোনো পুরস্কার নয়, শুধুমাত্র যজ্ঞের আহুতির মতো উৎসর্গ। বর্তমানে সারা দেশে ৮০ হাজার শাখা চলছে। এই কাজ দাঁড় করাতে অগণিত কার্যকর্তা নিজের বহু সময় সমর্পণ করেছেন।

ডাক্তারজী সঙ্ঘশাখা বিস্তার করার জন্য নিজের সম্পূর্ণ জীবন আহুতি দিয়েছেন। তিনি শিশু-বালকদেরও বাড়ি বাড়ি যেতেন। যদি তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করতেন, ডাক্তারজী কোথায় গেছিলেন? উত্তরে তিনি বলতেন, 'আমি ঈশ্বর দর্শন করতে গেছিলাম।' সঙ্ঘস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, তাতে রেখাঙ্কন করা, এটাও ঈশ্বরের কাজ। ১৯৪০ সালে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপণ অনুষ্ঠানে ডাক্তারজীর ভাষণ ছিল তাঁর শেষ ভাষণ। তিনি বলেছিলেন, আমি নাগপুরে থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতার কারণে আপনাদের কোনো সেবা করতে পারিনি। পুনের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। পরিচয় করাও সমাজ রূপী পরমেশ্বরের সেবা।'

নাগপুরে মোহিতেওয়াড়া সঙ্ঘস্থানের শাখা ডাক্তারজী ১৯২৫-২৬ সালে শুরু করেন। এখন ২০২৫ সাল। বিগত ১০০ বছরে শাখাগুলি চালিয়ে যেতে কত মুখ্যশিক্ষক তাদের ঘাম ঝরিয়েছে, তার কেউ হিসাব রাখেনি। শাখার অর্থই হলো নিরবচ্ছিন্ন চলতে থাকা সেবাযজ্ঞ। **সেবা হ্যায় যজ্ঞ কুণ্ড, সমিধা সম হম জ্বলে**— সেবাই হলো যজ্ঞকুণ্ড তাতে আমরা সমিধ রূপে জ্বলতে থাকি। কবিতার এই পঙ্ক্তি সারা দেশের স্বয়ংসেবকদের মুখেই শোনা যায়।

ডাক্তারজী শাখার তুলনা 'পাওয়ার হাউস'-এর সঙ্গে করতেন। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 'পাওয়ার হাউস' পরিচালনাকারীরা নিজের কাজ ছেড়ে কখনোই যেতে পারেন না। সঙ্ঘ শুরুর পর ডাক্তারজী অন্যান্য সমস্ত কাজ ছেড়ে দেন। শ্রীগুরুজী সঙ্ঘ শাখাকে কল্পবৃক্ষ বলতেন। তিনি বলতেন, 'তার ছায়াতে বসো, সবকিছু পাবে। দেশের কোণায় কোণায় সঙ্ঘের শাখা পৌঁছাও, সফলতাই সফলতা দেখতে পাবে।'

তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস শাখার বর্ণনা এভাবে করতেন, 'সঙ্ঘ শাখা কেবলমাত্র খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার স্থান নয়। এটি সজ্জনদের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি; যুবকদের নেশামুক্ত রাখার সংস্কারপীঠ; সমাজের উপর আগত আকস্মিক বিপত্তি বা সংকটে দ্রুত ও পক্ষপাতহীন সহায়তা দানের আশাকেন্দ্র; মহিলাদের নির্ভয়তা ও সুসভ্য আচরণ প্রাপ্তির আশ্বাসস্থল; দুষ্ট ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির উপর নিজ প্রভাব স্থাপনকারী শক্তি। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাতে সুযোগ্য কর্মী ও কার্যকর্তা পাওয়া যায়, তার প্রশিক্ষণদানকারী বিদ্যাপীঠ হলো সঙ্ঘশাখা।'

পূজনীয় শ্রীগুরুজী বলতেন, বিশুদ্ধ 'রাষ্ট্রভক্তির ভাবনার ভিত্তিতে ভেদাভেদ ভুলে সংগঠিত, তেজস্বী ও প্রভাবশালী সমাজজীবন নির্মাণ করার মহান কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। রাষ্ট্র কী? এর জ্ঞান ছাড়া রাষ্ট্রভক্তি তৈরি হতে পারে না। রাষ্ট্রভক্তির ভাবনা ব্যতিরেকে স্বার্থের অঞ্জলি দিয়ে রাষ্ট্রের জন্য পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। এজন্য বিশুদ্ধ রাষ্ট্রভাবনায় ভরপুর, শ্রদ্ধাযুক্ত ও পরিশ্রমী মানুষদের একসূত্রে বাঁধা, এক প্রবৃত্তির মানুষদের পরম্পরা নির্মাণকারী সংগঠন দাঁড় করানো এবং এই সংগঠনের শক্তিতে রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্ত দোষ নির্মূল করার প্রচেষ্টা করা একটি গঠনমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজ এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে না যে আমরা আমাদের অজস্র দৈনন্দিন সমস্যাকে কীভাবে সমাধান করি? সমাজের সমস্ত বিভেদ নির্মূল করে রাষ্ট্রভাবনায় ওতপ্রোত একাত্ম সমাজ জীবন নির্মাণ করা হলে অনেক নিত্য ও তাৎকালিক সমস্যার সহজেই সমাধান হতে পারে।' স্পষ্ট যে, এই কল্পনা এমন নয় যা কিছুদিন বা কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। এই লক্ষ্য পূর্তির জন্য হাজার হাজার জীবন প্রয়োজন, যারা শান্তির সঙ্গে নিরলস প্রচেষ্টা করে চলবে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)

বিশ্বায়নের সুফল-কুফল দুই-ই ভোগ করছে আমেরিকা

১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রিপাবলিকান পার্টির নেতা সিনিয়র জর্জ বুশ। এই ৪ বছরে বিভিন্ন দেশে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে থাকে কমিউনিস্ট শাসন। রোমানিয়া, পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি হয়ে শেষে সোভিয়েত পতন। ১১ ভাগে ভাগ হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। আধা কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসতে থাকে বড়ো পরিবর্তন। ১৯৯১ সালে ভারতে রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় এসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাও রাতারাতি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নেহরুভিয়ান মিশ্র অর্থনীতি। বাংলাদেশে এরশাদ জমানার পতন হলো। সেখানে ফিরল গণতন্ত্র। চীনেও গণতন্ত্রের লড়াই শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীরা, কিন্তু ট্যাঙ্ক ও কামানের সামনে তাঁদের শেষ করে দেওয়া হয়।

১৯৯২ সালে আমেরিকায় ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় আসে এবং রাষ্ট্রপতি হন বিল ক্লিন্টন। সারা বিশ্বকে একটা বাজারে পরিণত করার জন্য শুরু হয় তোড়জোড়। ঠিক হয় একশোর বেশি দেশ একত্রে একটি বহুজাতিক চুক্তিপত্রে সই করবে। সেই চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হবে কোন ক্ষেত্রে কে কত ভর্তুকি দিতে পারবে, কে কত কর বসাতে পারবে, বিভিন্ন দেশের পরিবেশ ও সামাজিক বিধি কী হবে ইত্যাদি। উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনুন্নত দেশগুলিকে একটু বেশি ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা থাকল এই চুক্তিতে। এই প্রস্তাবের উপর বেশ কয়েক বছর দর কষাকষি চলে বিভিন্ন দেশের। ভারত তখন দেউলিয়া হতে হতে আইএমএফের হাত থেকে কোনোরকমে মুক্তি পেয়েছে এবং এই চুক্তির বিষয়ে তেমন দর কষাকষির জায়গায় আসতে পারেনি। এই গ্যাট (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড টারিফ) চুক্তির আগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হতো। কেউ যদি গ্যাট চুক্তি না মানে, তবে তাকে ভরসা করতে হবে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির উপর এবং সেখানে গ্যাটের চেয়ে বেশি ছাড় পাওয়া যাবে এমন আশা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। অগত্যা ১৯৯৫ সালে এই চুক্তি সই করল বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এবং শুরু হলো বাণিজ্যের বিশ্বায়ন।

ক্লিন্টন ছিলেন ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রেসিডেন্ট, যে দলটি নিজেদের লেফট-লিবারাল বলে দাবি করে। আসলে এটি বেনামে একটি কমিউনিস্ট পার্টি। আমেরিকার মতো একটি সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক দেশে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের একটি হলো বামপন্থী দল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত পতনের পরে, চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী বানানোর জন্য গ্যাট চুক্তিকে হাতিয়ার করেন ক্লিন্টন। একের পর এক ছাড় দেওয়া শুরু হয় চীনকে। এর মধ্যে সবচেয়ে আত্মঘাতী হলো গ্যাট চুক্তি থেকে বাদ রাখা হয় মার্কিন মানবাধিকার কোড। আর এই সুবিধাকে হাতিয়ার করে পুনর্বাসন, পরিবেশ, শ্রমিক আইন ইত্যাদিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কম দামে পণ্য তৈরি করে সারা বিশ্বের বাজার ধরা শুরু করে চীন। এর সঙ্গে গত তিন দশকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে এবং মার্কিন প্রযুক্তি চুরি করে নিজের ভাষায় করে নেয় তারা, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একটি স্থায়ী ক্ষতি।

এখন বাণিজ্য তো হবে? কিন্তু সেটা কোন মুদ্রায়? এই ক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প হলো ডলার। এর কারণ মূলত তিনটি। এক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি। দুই, তেলের ব্যবসা মূলত ডলারেই হতো। তিন, কমিউনিস্ট দুনিয়ার পতন। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং (বা উৎপাদন শিল্প) পাঠিয়ে দেয় চীনে এবং পরিষেবার (সার্ভিস সেক্টরের) বড়ো অংশ ভারতে। তাদের হাতে ছিল প্রযুক্তি ও গবেষণার পরিকাঠামো। তারা ডলার ছাপিয়ে কম দামে সারা পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম, পণ্য ও পরিষেবা জলের দরে ভোগ করতে থাকে পরের দুই দশক। ডলার আন্তর্জাতিক মুদ্রা হওয়ায় সারা পৃথিবী ডলার কেনা শুরু করে এবং আরও ধনী হয়ে ওঠে আমেরিকা। কেউ বন্ড আকারে, কেউ বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য কিনতে ও সঞ্চয় করতে থাকে ডলার। এইভাবে একসময় দেখা যায় আমেরিকার মোট পণ্য ও পরিষেবা বাবদ মোট উৎপাদনের (জিডিপি-র) চেয়ে অনেক বেশি মূল্যের ডলার ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্যা হলো সবাই যদি সেই ডলার ফেরত দেওয়া শুরু করে!

ইউরোপ ১৯৯৯ থেকেই ইউরো মুদ্রা বাজারে ছাড়া শুরু করে। কিন্তু ইউরোপের দুটি সমস্যা। এক, তেলের ব্যবসা তাদের হাতে নেই, এবং দুই, শক্তিক্ষেত্রে তারা রাশিয়া ও আমেরিকার প্রতি নির্ভরশীল। তাই ইউরোপ তাদের কাছে কোনো সমস্যা না হলেও চীনের উত্থান এবং ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়ার পুনরুত্থান চিন্তায় ফেলে আমেরিকাকে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের ব্রিকস্ মুদ্রা নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে যেকোনো দেশের ব্যবসার ক্ষেত্রে সেই মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা চালু করলে অধিকাংশ দেশ তাদের সঞ্চিত ডলার আমেরিকাকে ফেরত দিতে পারে? ব্রিকস্ দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া-সহ এমন কিছু দেশ রয়েছে যারা আরব দেশের তেল ছাড়াই তাদের অর্থনীতি সচল রাখতে সক্ষম। তাছাড়া আরব যদি বেঁকে বসে বা চীনের দিকে ঘুরে যায়? তখন কে নিজের কাছে ডলার রাখবে? আর সবাই ডলার ফেরত দিলে আমেরিকার কী হবে?

ডলার সমস্যা ছাড়াও, তিন দশক ধরে বিশ্বায়ন ব্যবস্থা চলার পর আমেরিকা আজ উৎপাদন ক্ষেত্রে খুব খারাপ জায়গায় গিয়েছে। ডলার ছেপে সস্তায় বিদেশ থেকে পণ্য পেলেও, আমেরিকায় বেকারত্বের শিকার অধিকাংশ মানুষ। এখন আমেরিকার সামনে একটাই রাস্তা। তাদেরকে উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে হবে এবং ডলারের মূল্য হ্রাস করতে হবে। উৎপাদনে আত্মনির্ভর হতে হলে নিজের দেশের উৎপাদন শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। তাই এই শুল্ক। তাতে আমেরিকান বাজারে পণ্য ও পরিষেবার দাম বাড়লেও, উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে পারবে আমেরিকা। সঙ্গে কমবে ডলার মূল্য। ডলার মূল্য যত কমবে, আমেরিকারও ততই কমবে ঋণের বোঝা। এর সঙ্গে বাড়বে রপ্তানি ও উৎপাদন। তত কম শোধ করতে হবে আন্তর্জাতিক ঋণ। তাই ডোনাল্ড ট্রাম্প নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসনের নীতি হলো বিদেশি পণ্যের উপর চড়া হারে শুল্ক আরোপ করে পুরো বিশ্ব অর্থব্যবস্থা ঘেঁটে দেওয়া। মার্কিন অর্থনীতির উপর বড়ো বিপদ আসার আগে হাতে কিছুটা সময় নিয়ে নেওয়া। □

সঙ্ঘ শতবর্ষে পঞ্চ পণের একটি নাগরিক শিষ্টাচার

সুব্রত ভৌমিক

ভারতীয় বিচার সাধনা, জ্ঞান পরম্পরার প্রধান বৈশিষ্ট্য শুধু জ্ঞান বা বুদ্ধি নয় বরং অনুভূতি, উপলব্ধিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অনুভূতিশূন্য জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা বোঝানোর জন্য একটি সংস্কৃত সুভাষিতমে বলা হয়েছে—

যথা খরশ্চনন্দনবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।।

অর্থাৎ ভারবাহী গাধার পিঠে চন্দন কাঠের বোঝা থাকলে গাধা শুধু ওজন বা ভার বুঝতে পারে, চন্দনের গন্ধ বা গুণ অনুভব করতে পারে না। তাই কোনো ব্যক্তি যতই জ্ঞানী বা পণ্ডিত হোন না কেন, যদি তার অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা না থাকে তবে তার সমস্ত জ্ঞান নিষ্ফল। এই অনুভূতির অভিব্যক্তি বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে হয়। আবার অনুভূতি যুক্ত বিচারবুদ্ধিই যথেষ্ট নয়। যদি প্রাত্যহিক আচার-আচরণ, ব্যবহার, কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয় তবে আমাদের আদর্শগত সাধনা ও জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া বা চক্রটি সম্পূর্ণ হয়। আদর্শগত সাধনার সুদীর্ঘ যাত্রাপথে বিচারবুদ্ধির অবস্থান মাঝখানে— সর্বপ্রথমে তাঁর মূল অনুভূতি এবং শেষে আচার-ব্যবহার। রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণ এবং বিশ্বে ভারতের ভূমিকা সম্বন্ধে ভাববার সময় আমাদের এই তিনটি বিষয় নিয়েই ভাবতে হবে।

মেকলে সাহেব শিক্ষানীতি চালু করার সময় বলেন এর মধ্যে দিয়ে যে ভারতীয়রা বেরিয়ে আসবেন তারা হবেন— 'Indian in blood and colour but English in taste, opinion, moral and intellect.' স্বাধীনতার এত বছর পরেও সেই টেস্ট অনুযায়ী প্যাটিস, পিৎজা, বার্গার, কোক অগণিত মানুষের প্রিয় হয়ে উঠেছে। সেই ইংলিশ ওপিনিয়ন অনুযায়ী দেশজ সমস্ত ভাবনাচিন্তা মূল্যহীন, পাগলের প্রলাপ মাত্র। সেই moral অনুযায়ী ত্যাগ, কর্তব্য ও সেবা-প্রধান হিন্দু জীবনমূল্যের পরিবর্তে ভোগ প্রধান ধারণাই শ্রেষ্ঠ। সবকিছুকে যেন আমরা মেকলে আরোপিত দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করি। যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে ভাববার সময় হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং তার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল সেটা ভুলে গিয়ে প্রথমেই মাথায় আসে যে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ নামক পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জগৎই আমাদেরকে পরিবেশ-সচেতন হতে শিখিয়েছে। সম্পূর্ণ ভুলে যাই যে পাশ্চাত্যের শিল্প সভ্যতা এবং চূড়ান্ত ভোগবাদী জীবনশৈলীই সমস্ত ধরনের পরিবেশ দূষণের খলনায়ক। একইভাবে নাগরিক শিষ্টাচার প্রসঙ্গ এলেই মনে হয় যে 'সিভিক' নামক পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাই নাগরিক শিষ্টাচার বিষয়ে সচেতন করেছে। সেই অনুসারে নাগরিক শিষ্টাচার শুধুমাত্র courtesy বা সৌজন্যবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়, তার মধ্যে আন্তরিকতা থাকে না।

কোনো অজানা, অচেনা বা অল্প পরিচিত ব্যক্তির থেকে উপকার বা সাহায্য পেলে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তার সঙ্গে হয়তো আমার আর দেখাই হবে না বা দেখা হওয়াটা অনিশ্চিত। কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণে আজ কথায় কথায় স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে 'থ্যাঙ্ক ইউ'-এর যথেচ্ছ ব্যবহার মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। বাবা, মা-সন্তান, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, ছাত্র-শিক্ষক, বন্ধু, প্রতিবেশী ইত্যাদি যারা প্রতিদিন বা নিয়মিত আমাদের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মধ্যে থাকেন তাদের মধ্যেও এই 'থ্যাঙ্ক ইউ'-এর আদান প্রদান চলে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে আমরা কেউই আর একাত্ম, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বিশ্বাসী নই, সবাইকে যেন পর মনে করতে শুরু করেছি। একদিকে যেমন প্রত্যেকেই কোনো কিছু করার বিনিময়ে ধন্যবাদের প্রত্যাশী, অন্যদিকে নিজেরাও ভাবি যে নিকটজনকেও যদি ধন্যবাদ না দিই তাহলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন অথবা আমাকে অভদ্র ভাববেন। অথচ আমাদের পরম্পরায় এটাই শেখানো হয় যে আপনজনকে ধন্যবাদ দিতে নেই। দ্বিতীয়ত, অল্প ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি উপকার করেন এবং আমিও আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ হই তবে তা শরীরের ভাষা, মুখের ভাব এবং পরবর্তীকালে তার প্রতি আমার ব্যবহারেই সেটা ব্যক্ত হবে। তার জন্য শুধু যান্ত্রিকভাবে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলাটাই যথেষ্ট নয়। অথচ ছোটো থেকে এখন সেটাই স্বাভাবিক প্রবণতা করে তোলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি নাটের গুরু। পাশ্চাত্য শিষ্টাচার বলতে যা বোঝে আমাদের সন্তানকে তাই গেলানো হচ্ছে। একটা বিদেশি ভাষা শেখাতে গিয়ে বিদেশি সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার শেখানো হচ্ছে।

পাশ্চাত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাবা-মায়েরা সন্তানকে নিজেদের আনন্দ-ফুর্তি-উদ্দাম জীবনের পক্ষে বাধাস্বরূপ মনে করে। তাই বিনা কারণে অতি ছোটো বয়সেই হোস্টেলে পাঠায় বা ডিভোর্সের কারণে হয় সৎ মা-বাবার কাছে বড়ো হয়। স্বাভাবিকভাবেই ওইসব দেশে বছরে একটি দিন ঘটা করে 'চিলড্রেনস ডে' পালনের আদিখ্যেতা দেখাতে হয়। আমাদের এখানে শিশুরা ৩৬৫ দিনই মায়ের কোল বা আঁচল ছাড়া থাকে না। অথচ আমাদের দেশেও চিলড্রেনস ডে বা শিশু দিবস পালনের আদিখ্যেতা দেখা দিয়েছে। এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে।

শিষ্টাচার হলো শিষ্ট ও আচার শব্দের মেলবন্ধন অর্থাৎ শিষ্ট বা সজ্জন ব্যক্তির আচার, আচরণ হচ্ছে শিষ্টাচার। সজ্জন ব্যক্তি কে? মহাভারতে সজ্জন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

আর্যতানামভূতানাং যঃ করোতি প্রযত্নতঃ।
শুভং কর্ম নিরাকারো বিতরাগস্তথৈব চ।।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৬২-১৮)

ফ ঃ ২

অর্থাৎ ব্যক্তি যদি নিজেকে প্রকাশ না করে সযত্নে প্রাণীকুলের কল্যাণের জন্য কাজ করেন, তাহলো তাঁর সেই শ্রেষ্ঠ ভাব ও আচরণকে সজ্জনতা বলে। হিন্দু জীবনচর্যায় শিষ্টাচার কোনো লোক দেখানো বিষয় নয়। এটা মূলত অন্তঃকরণ জাত ও সংস্কারপ্রসূত বিষয়।

পাশ্চাত্য ধারণায় শিষ্টাচার বলতে সমপর্যায়ের (শিক্ষা, অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দিক থেকে) ব্যক্তিদের পারস্পরিক আচরণ বোঝায়। যেমন রাজায় রাজায়, প্রজায় প্রজায়, জ্ঞানীর সঙ্গে জ্ঞানী ইত্যাদি। হিন্দু জীবনচর্যায় উপরোক্ত মাপকাঠিতে এগিয়ে থাকা ব্যক্তি তার থেকে অনেক পিছিয়ে থাকা বা একেবারে প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে কীরকম আচরণ করছেন তার ভিত্তিতে শিষ্টচার বিচার হয়। মহাভারতকার মহর্ষি ব্যাসদেব বলেছেন—

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেষাং পরপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতৎ জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়।।

অর্থাৎ খল বা দুষ্ট ব্যক্তির বিদ্যা বিবাদ করতে, ধন অহংকার করতে এবং শক্তি অপরকে কষ্ট দিতে ব্যবহৃত হয়। সাধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিপরীত— বিদ্যা জ্ঞানার্জনের জন্য, অর্থ দানের জন্য এবং শক্তি অপরকে রক্ষা করার জন্য। সাধু ব্যক্তির এই নিজস্ব গুণগুলির আদর্শ প্রয়োগই শিষ্টাচার।

শিষ্টাচারের প্রেরণা হবে কর্তব্যবোধ। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য moral অনুযায়ী সমাজ হয়েছে অধিকার সচেতন। ফলে পরিবারে বাবা-মার প্রতি সন্তান, স্বামি-স্ত্রী পরস্পর, শিক্ষকের প্রতি ছাত্র শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারছে না। আবার শিষ্টাচার যে সবসময় বয়সে ছোটোরাই গুরুজনদের প্রতি দেখাবে তা নয়, ছোটোদের প্রতিও বড়োদের শিষ্টাচার দেখানো উচিত। প্রখ্যাত জার্মান কথাসাহিত্যিক গ্যেটে বলেছেন, বড়োদের সামনে ছোটোদের হাত থেকেও যদি কোনো জিনিস পড়ে যায় তবে বড়োদের সেটা তুলে তার হাতে দেওয়া উচিত। এতে ছোটোদের মন জয় করা যায়।

শিষ্টাচারের মূলে কোনো ছলনা, চাতুরি বা স্বার্থবুদ্ধি থাকা উচিত নয়। এ ব্যাপারেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য'-গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলছেন, ভারতে যদি কোনো ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোনো পুরুষের সাক্ষাৎ হয় তবে নমস্কার বিনিময়ের পর আমরা সাধারণত সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রেখে তার সঙ্গে ন্যূনতম আলাপচারিতা করি। কিন্তু পাশ্চাত্যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে পুরুষটি অতি আগ্রহের সঙ্গে মহিলাটির দিকে একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে বলে। মহিলাটি তার সৌজন্য দেখে খুবই প্রীত হয়। কিন্তু একটু পরেই পুরুষটি বলতে শুরু করে আপনার মাথার চুলগুলি কত সুন্দর, চোখ দুটি কত সুন্দর, তারপর ঠোঁট— এভাবে বর্ণনা ক্রমশ নীচের দিকে নামতে থাকে। এই ধরনের courtesy বা সৌজন্য প্রাচ্যের দৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয় নয়।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হতে পারে শিষ্টাচার মানে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য গুরুগম্ভীর কিছু বিষয় যার জন্য অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংস্কার প্রয়োজন। সেটা অবশ্যই একটি দিক কিন্তু কিছু সামান্য নিত্য আচরণও রয়েছে যার জন্য খুব বেশি ত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার করতে হয় না অথচ যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর এবং যার মাধ্যমে সমাজের সকলের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নততর হয়। ইংরেজিতে প্রবাদ আছে—

Good Better Best
Never let them rest
Till your good is better
And better is the best.

অর্থাৎ শিষ্টাচার এক বিরামহীন প্রক্রিয়া, যতদিন না আমাদের প্রত্যেকের আচরণ দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির তুলনায় ভালো অর্থাৎ উন্নততর হয় এবং ধীরে ধীরে সকলের থেকে ভালো অর্থাৎ ভালোতম হয়। এই মানসিকতা নিয়ে নিম্নোক্ত ন্যূনতম শিষ্টাচারগুলি আমরা আমাদের মজ্জাগত করে তুলতে পারি যাতে অবচেতন মনেও আমরা এগুলি পালন করতে ভুলে না যাই। মন, বুদ্ধি, শরীর ও চেতনা দিয়ে বিচার করা এবং নিজেকে সেই ভাবে পরিচালনা করা। যেমন—

- যে কোনো সর্বজনীন স্থানের নিয়ম, ব্যবস্থা ও সূচনা মনোযোগ সহকারে পালন করা। নিজের সুবিধার আগে অন্যের সুবিধা নিয়ে ভাবা। সামূহিক জীবনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো অসুবিধা মন থেকে মানিয়ে নেওয়া।
- ত্যাগের ক্ষেত্রে সবার আগে থাকা এবং ভোগের ক্ষেত্রে সবার পেছনে থাকা। পরিশ্রম, কর্তব্য এ সমর্পণের ক্ষেত্রে আগে থাকা।
- ছোটোদের প্রতি স্নেহ এবং গুরুজনদের প্রতি সম্মানপূর্ণ ব্যবহার।
- আত্মীয়স্বজন বন্ধু, সহকর্মী, প্রতিবেশী সকলের ক্ষেত্রে শুধু আনন্দ অনুষ্ঠানেই নয় বরং হাসপাতাল থেকে শ্মশান সর্বত্র ও সব ধরনের সমস্যার সময় পাশে থাকার চেষ্টা করা।
- বাসে, ট্রেনে বা অন্য সর্বজনীন স্থানে বিশেষভাবে প্রবীণ, অসুস্থ ও দিব্যাঙ্গদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ এবং প্রয়োজনে সাহায্য করা।
- কারও সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হ্যালো, হাই না বলে নমস্কার, সুপ্রভাত ইত্যাদি অভিবাদন করা।
- সঠিক শব্দের প্রয়োগ করা।
- অতিথি দেব ভব— মনে রেখে সেই মতো আচরণ করা।
- জন্ম দিবস হিন্দু তিথি অনুযায়ী এবং হিন্দু পদ্ধতিতে পালন করা।
- মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্মে ভারতীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরা।
- খাওয়ার সময় টিভি না দেখা, মোবাইল ফোনের ব্যবহার না করা।
- অযথা তর্ক না করা। মনে রাখতে হবে যে, তর্কে জিতলেও আমি মানুষটির মন জয় করতে পারবো না।
- মার্জিত ভাষায় অন্যের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়ে নিজের বক্তব্য বা মত প্রকাশ করা। অন্যের কথা সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই বলার অভ্যাস। টিভি চ্যানেলের বিতর্কসভার মতো অন্যের কথার মাঝে কথা না বলা।
- স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে কথা বলা উচিত।
- সত্যং বদ ধর্মং চর। ধর্মের জন্য বাঁচা, সমাজের জন্য বাঁচা।
- জীবিত অবস্থায় রক্তদান, মৃত্যুর সময় নেত্র দান।
- পশুপক্ষীর সঙ্গে উচিত ব্যবহার।
- অহিংসা পরমো ধর্মঃ ইত্যাদি।

দেশের সমস্ত নাগরিক যদি শিষ্টাচার সম্পন্ন হয়ে ওঠে, তাহলেই খুব শীঘ্র উন্নতজীবনের স্বাদ পাওয়া যায়।

সমাজ পরিবর্তনে সঙ্ঘের বিবিধ সংগঠনের ভূমিকা

আনন্দ মোহন দাস

দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে একসময় ভারতে হিন্দুদের মনোবল একেবারে তলানিতে ঠেকে গিয়েছিল। বললে অত্যুক্তি হবে না, এই সময় হিন্দুরা নিজেদের গাধা বলতে প্রস্তুত থাকলেও নিজেদের হিন্দু বলতে লজ্জা পেত এবং কুণ্ঠাবোধ করতো। হিন্দু সমাজের আত্মবিশ্বাস একেবারে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, কেবলমাত্র শবযাত্রা ছাড়া চারজন হিন্দু একমুখী হতে পারে না। সেক্ষেত্রে হিন্দু সংগঠনের চিন্তা বাতুলতা মাত্র। সেই কঠিন সময়ে ১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিন প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ গড়তে নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি হিন্দু সংগঠনের যে বীজ রোপণ করেছিলেন, আজ তা মহীরূহে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নাম সর্বজনবিদিত। সঙ্ঘ উপেক্ষা, উপহাস, বিরোধিতার পর্যায় পেরিয়ে এসে আজ বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। যুবসমাজ ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ডাক্তার হেডগেওয়ারের আদর্শ ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে এগিয়ে আসছেন। সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সঙ্ঘ আজ শতবর্ষের পর্দাপর্ণ করেছে। যাঁদের পরিশ্রম ও ধ্যেয়নিষ্ঠায় সঙ্ঘ কাজের বৃদ্ধি, তাঁদের অবদানকে স্মরণ করার দিন। শতবর্ষে আত্ম চিন্তন ও সঙ্ঘ কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণে ব্রতী হওয়ার সময়।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ডাক্তার হেডগেওয়ার জীবদ্দশাতেই সঙ্ঘকে সর্বভারতীয় রূপ দিতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পর দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার (শ্রীগুরুজী) সেই কাজকে সর্বব্যাপী ও সর্বস্পর্শী করার উদ্দেশ্যে বিবিধ ক্ষেত্রে অনেক সংগঠনের সূচনা করেছিলেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে হিন্দুত্বের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে এক ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ গঠনে ব্রত হয়েছিলেন। স্বয়ংসেবকদের মধ্যে শুধু হিন্দুত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু এই একাত্মতার ভাবটি এখন সম্পূর্ণ সমাজে ব্যাপ্ত করতে হবে। তাই সঙ্ঘ রূপী বটবৃক্ষের বহু শাখা প্রশাখা আজ প্রসারিত। বর্তমানে বিবিধ ক্ষেত্রে ৩৭টির বেশি সংগঠন সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। সঙ্ঘ একটি সামাজিক সংগঠনও বটে। পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে সঙ্ঘের কাজকে পৌঁছাতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে বিবিধ সংগঠন কাজ করে চলেছে। এই রকম কয়েকটি সংগঠনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এদিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৫২ সালে একজন স্বয়ংসেবক সমাজের মধ্যে কাজ করার জন্য বনবাসী কল্যাণ আশ্রম নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেছেন। জনজাতি সমাজের পরম্পরা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বজায় রেখে তাদের কল্যাণে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম কাজ করে চলেছে। জনজাতি সমাজকে খ্রিস্টান মিশনারিদের কবল থেকে রক্ষা করতে এবং তাদের উন্নয়নে কল্যাণ আশ্রম বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে চলেছে। বর্তমানে সারা দেশে ২২ হাজার ২০৩টি সেবাকেন্দ্র ও বহু ছাত্রাবাসের মাধ্যমে কল্যাণ আশ্রম জনজাতি এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

এছাড়াও সমাজে কেবলমাত্র সেবা কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী নামে স্বয়ংসেবকদের একটি সংগঠন সারা দেশে ১ লক্ষ ২৩ হাজারেরও বেশি সেবা প্রকল্প গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বনির্ভর প্রকল্প এবং সামাজিক সেবা প্রকল্প রয়েছে যা বেসরকারি ক্ষেত্রে সেবা কাজের জন্য যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো শিক্ষা। প্রচলিত মেকলে শিক্ষা পদ্ধতি দেশে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। বরং আমাদের সনাতন শিক্ষা পদ্ধতির সর্বনাশ করেছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও সংস্কার যুক্ত ভারতীয় শিক্ষা

পদ্ধতির বিকাশ ঘটেনি। ভারতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো প্রচলন নেই। বলাবাহুল্য বর্তমান প্রজন্ম লক্ষ্যহীন হয়েছে এবং নৈতিকতার অভাব দেখা দিয়েছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে একটি উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানোর কাজ করে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাভারতী নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারা দেশে ২২০০০-এর বেশি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। শিক্ষা, সংস্কার ও সেবার লক্ষ্য নিয়ে এই বিদ্যালয়গুলিকে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্বয়ংসেবকরা সচেষ্ট হয়েছেন। এর মাধ্যমে সুসংস্কার যুক্ত নাগরিক গড়ে তোলাই কাজ। এমনকী জনজাতি অঞ্চলে যেসব শিক্ষা কেন্দ্র শুরু হয়েছে, সেখানকার বিদ্যার্থীরাও যাতে পরবর্তীকালে সুনাগরিক রূপে গণ্য হতে পারেন, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিক ক্ষেত্রে বিদেশি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কমিউনিস্ট শ্রমিক সংগঠনগুলি শ্রমিকদের ভুল পথে পরিচালিত করে রাষ্ট্রের পরিপন্থী কাজ করে চলেছে। সেজন্য সঙ্ঘ হিন্দু চিন্তাধারায় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ নামে একটি রাষ্ট্রবাদী শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলেছে। বিএমএসের উদ্দেশ্য হলো শিল্পের শ্রমিকীকরণ, শ্রমিকের জাতীয়করণ এবং রাষ্ট্রের উদ্যোগীকরণ। আজকের দিনে বিএমএস সারা ভারতে সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দুত্বের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কাজ করে চলেছে যা আজ সারা দেশের মধ্যে বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন। বিদ্যার্থী পরিষদ রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে যুবসমাজকে সঠিক পথে দিশা দেখানোর কাজ করছে।

আর্থিক ক্ষেত্রে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের মাধ্যমে দেশীয় পণ্য উৎপাদন, স্বদেশী বস্তু গ্রহণ, বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় অর্থনীতিকে মজবুত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। বিদেশি কবল থেকে মুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল স্বদেশী অর্থনীতির জন্য সমাজের মধ্যে জাগরণের কাজ করছে এবং প্রয়োজনে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে সাধুসন্তদের সঙ্গে নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দু জাগরণের কাজ হাতে নিয়েছে। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্গকে একই ছত্রতলে ভেদভাবহীন সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ নির্মাণে ব্রতী হয়েছে। এছাড়াও ধর্মান্তকরণ রুখতে সমাজের বিভিন্ন বর্গের মধ্যে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন মত ও পথের সাধু সন্তরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিন্দুদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছেন। এই ভাবে বিবিধ সংগঠনগুলি ভারতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক পরিবর্তনের কাজে শামিল হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শতবর্ষের প্রেক্ষিতে সঙ্ঘ সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছে যা আজকের দিনে সমাজে তার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে—(১) ভেদভাবহীন সমরসযুক্ত আচরণ, (২) পরিবেশবান্ধব জীবনশৈলী, মূল্যবোধ অধিষ্ঠিত পরিবার, (৩) 'স্ব' ভাব যুক্ত আচরণ এবং (৪) নাগরিক কর্তব্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ সমাজ নির্মাণ।

১০০ বছরের যাত্রাপথ স্মরণ করে বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সমগ্র সমাজকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ংসেবকরা ভেদভাবহীন ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ নির্মাণের সংকল্প নিয়েছে। এই লক্ষ্যকে সফল করার জন্য বিবিধ সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের কাজে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেছে। □

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

সুস্থ ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে আরোগ্য ভারতী

অঙ্কিতা সুর

'আরোগ্যম্ মম স্বভাবঃ অধিকারঃ কর্তব্যং চ।' অর্থাৎ 'সুস্থ থাকা আমার স্বভাবগত অধিকার এবং কর্তব্যও'। সুস্বাস্থ্য মানে কেবল রোগমুক্ত থাকা নয়, বরং শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকেও সুস্থ থাকা। পাশ্চাত্য প্রভাব, আধুনিকতা ও নগরায়ণের ফলে মানুষের জীবনধারা ও দিনচর্যাতে আমূল পরিবর্তন এসেছে এবং তার ফলে মানুষের শরীরে ও মনে বহু রোগ বাসা বেঁধেছে। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, হৃদরোগ। এছাড়াও আরও বিভিন্ন সমস্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি দেশ তথা সমাজের উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশবাসীর সুস্থ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। শুধু রোগ নিরাময় নয় বরং কীভাবে নিজেকে সুস্থ রাখা যায় সেই বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আরোগ্য ভারতীর মতো সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

ভারতীয় জীবনমূল্যের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যচর্চা, প্রতিরোধক ও উপকারী স্বাস্থ্যসেবা সমাজের প্রত্যন্ত প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া এবং প্রতিটি ব্যক্তি যেন সুস্থ থাকে— এই লক্ষ্য নিয়ে ২০০২ সালের ২ নভেম্বর, (১৩ কার্তিক, যুগাব্দ ৫১০৪) ধন্বন্তরি জয়ন্তীর শুভদিনে কেরালার কোচিতে 'আরোগ্য ভারতী'র প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৯ জুলাই, ২০০৪ সালে ভোপালে 'আরোগ্য ভারতী' পাবলিক ট্রাস্ট'-এর নামে যথাযথভাবে নিবন্ধিত করা হয়। বিগত ২২ বছরে দেশের মোট ৪১টি প্রান্তে আরোগ্য ভারতীর সক্রিয় কার্যকলাপ চলছে। সম্পূর্ণ দেশের মোট ৮৭১টি সাংগঠনিক জেলাতে আরোগ্য ভারতীর সক্রিয় কার্যকর্তা রয়েছেন।

২০০৭ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ডাঃ গোপাল করের হাত ধরেই আরোগ্য ভারতীর সূচনা হয় পশ্চিমবঙ্গে। তিনি পশ্চিমবঙ্গে আরোগ্য ভারতীর প্রথম সংযোজক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হওয়ার কারণে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি অত্যন্ত সহজভাবে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে সক্ষম। তিনি বর্তমানে আরোগ্য ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সমিতির অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষ নিজেদের আরোগ্য ভারতীর সঙ্গে যুক্ত করে সমাজ কল্যাণে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন।

হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, ন্যাচারোপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি ইত্যাদি বিভিন্ন মতের চিকিৎসকরা আরোগ্য ভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ২০১৩ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক বুদ্ধদেব মণ্ডল পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর সারা রাজ্যে ব্যাপকভাবে আরোগ্য ভারতী বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে তিনি পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক এবং রাজেশ কর্মকার পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ তিনটি প্রান্ত হওয়ায় তিনটি আলাদা করে সমিতি গঠন করা হয়। উত্তরবঙ্গের ১৫টি জেলা (শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, ঈশ্বরপুর, কোচবিহার ইত্যাদি), মধ্যবঙ্গের ১৫টি জেলা (বর্ধমান, আসানসোল, দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ, উত্তর নদীয়া, উত্তর বীরভূম, তারকেশ্বর ইত্যাদি) এবং দক্ষিণবঙ্গের মোট ১৬টি জেলায় (কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব, কলকাতা দক্ষিণ-পশ্চিম, বারাসাত, বসিরহাট, হাওড়া গ্রামীণ, সুন্দবর, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি, তমলুক ইত্যাদি) আরোগ্য ভারতীর কার্যকলাপ সক্রিয়ভাবে চলছে।

আরোগ্য ভারতীর মোট ২৪টি আয়াম রয়েছে তার মধ্যে বর্তমানে দশটি আয়ামের ওপর পশ্চিমবঙ্গে কাজ চলছে। প্রতিবছর ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস এবং ধন্বন্তরি জয়ন্তী পালন সংগঠনের অনিবার্য কার্যের মধ্যেই পড়ে। একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াম হলো 'আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ' যেখানে দুই দিনের বর্গে বিভিন্ন ডাক্তার, যোগ বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদরা আসেন এবং মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান প্রদান করেন।

এই বর্গে মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করেন। 'সুস্থ জীবনশৈলী', বনৌষধি প্রচার প্রসার, কিশোর বিকাশ, যোগ, পর্যাবরণ, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কার্যক্রম, নেশামুক্তি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আয়ামগুলি সফলভাবে আরোগ্য মিত্ররা পরিচালনা করছেন। সুস্থ ব্যক্তি, সুস্থ পরিবার, সুস্থ গ্রাম এবং সর্বোপরি সুস্থ ভারত গড়ার প্রচেষ্টা আরোগ্য ভারতী প্রতিনিয়ত করে চলেছে। □

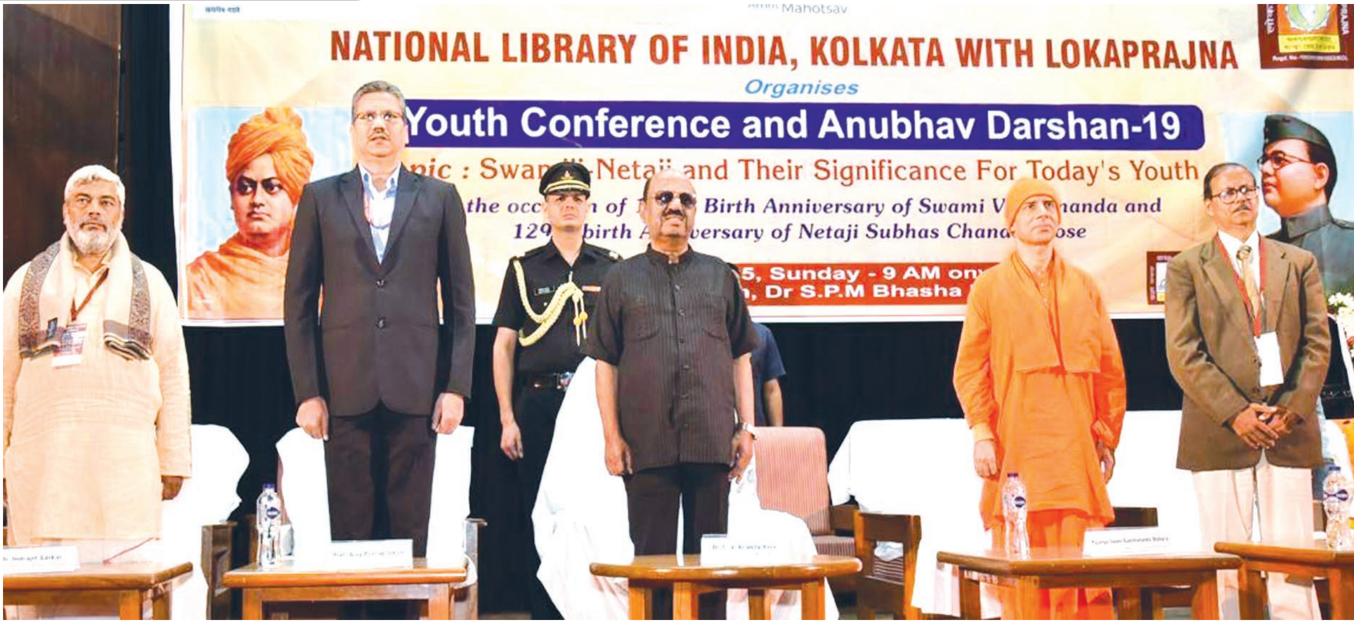

প্রবুদ্ধ মননে সংস্কার সাধনে লোকপ্রজ্ঞার অগ্রগতি

প্রফেসার (ড.) সোমশুভ্র গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে বিগত এক-দশকে ভারতীয় প্রবুদ্ধ মননে সংস্কার সাধনের কোনো প্রচেষ্টা যদি কোনো সংগঠন করে থাকে, তবে সেটি হলো লোকপ্রজ্ঞা। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যশাসনের ভরকেন্দ্র বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত না হওয়ায় সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমশ বিলীন হওয়ার একটা আশঙ্কা প্রকট হচ্ছিল। কিন্তু সঠিক সময়ে লোকপ্রজ্ঞার উদয়, উন্মেষ ও উত্তরণের মাধ্যমে এবং সহমর্মী সংগঠনগুলির সহায়তায় বঙ্গসমাজের মননকে ভারতীয় ভাবধারায় পুনর্জারিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে। বঙ্গ মননে অবিচ্ছেদ্য ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরম্পরা, কৃষ্টি ও মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, প্রকট হচ্ছে নিজেদের মূলভাবধারায় প্রত্যাবর্তনে। এটি আজগুবি কোনো দাবি নয়। বৈদ্যুতিন প্রভাবের সামাজিক মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত পর্যবেক্ষণ করলেই বিষয়টির প্রমাণ মেলে।

লোকপ্রজ্ঞা সর্বভারতীয় প্রবুদ্ধমঞ্চ প্রজ্ঞা প্রবাহের বঙ্গীয় শাখা। লক্ষ্য একটিই, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। লোকপ্রজ্ঞার তিনটি প্রান্ত--- উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ। ঐতিহাসিক বেলুড় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় হতে যাত্রা শুরু ২০১৮ সালে। যদিও উৎপত্তিগতভাবে প্রারম্ভ ২০১৪ সালের ৯ নভেম্বর প্রজ্ঞা প্রবাহের বারাণসীতে অখিল ভারতীয় বৈঠকে। সেই বৈঠকে তৎকালীন অখিল ভারতীয় সংযোজক ড. সদানন্দ সাপ্রেজীর আগ্রহে প্রবুদ্ধমঞ্চের তদানীন্তন পালক শ্রীদত্তাত্রেয় হোসবোলেজী সঙ্ঘ প্রচারক শ্রীঅরবিন্দ দাশের নাম প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্ব ক্ষেত্র সংযোজক ঘোষণা করেন।

সাত বছরের মধ্যেই চারাগাছ থেকে মহীরুহের আকার ধারণ। স্থানগত, বিষয়গত, বয়সগত বৈচিত্রে এর এক-একটি একককে বলা হয় চর্চাকেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গে তিনপ্রান্ত তথা রাজ্যে এই মুহূর্তে সাংগঠনিক ও শৈক্ষণীক বিভাগ নিয়ে লোকপ্রজ্ঞার চর্চাকেন্দ্রের সংখ্যা ষাটের বেশি। প্রজ্ঞা প্রবাহের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী লোকপ্রজ্ঞার উদ্দেশ্য, শর্তাবলী ও কার্যাবলীর প্রতি প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত। প্রতিটি পঞ্চ বিন্দুতে। প্রজ্ঞাপ্রবাহের প্রতীক চিহ্নে বোধবাক্য 'জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতম্'। শ্রীমদ্ভগবদগীতা হতে প্রাপ্ত। লোকপ্রজ্ঞার প্রতীক চিহ্নে বোধবাক্য 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যক্তং যেন চরাচরং'। গুরুপ্রণাম মন্ত্রের অংশ।

এর শর্তাবলী হলো, লোকপ্রজ্ঞা নিঃশর্ত নয়; এর শর্ত বিন্দুগুলি নিম্নরূপ :

অরাজনৈতিক, ইতিবাচক, সময়ানুবর্তিতা, বিষয় প্রাসঙ্গিকতা এবং আলোচনাকালে নিজেকে মনোযোগী রাখা।

কার্যাবলীর বিন্দুগুলি নিম্নরূপ :

প্রজ্ঞাবান হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞান চর্চা করা। গঠনতান্ত্রিকভাবে সমাজের শিক্ষিত অংশের জন্য হলেও লোকপ্রজ্ঞা সবার। কিন্তু প্রবুদ্ধ তিনিই, যিনি নিয়মিত অধ্যয়ন করেন, জ্ঞানচর্চার মধ্যে থাকেন।

প্রতি সপ্তাহে, পাক্ষিকভাবে অথবা মাসে অন্ততপক্ষে একবার নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট বিষয়ে চর্চাকেন্দ্র সদস্যদের সম্মিলিত চর্চা আবশ্যক। সময়ানুবর্তিতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত।

আলোচনার বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক ও পূর্বনির্ধারিত থাকে। এটি হয় অখিল ভারতীয়

প্রজ্ঞাপ্রবাহ নির্ধারিত বিষয়সূচি (সম্প্রতি সর্বভারতীয় স্তর থেকে ১৫টি বিষয়সূচি নিয়ে গবেষণার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে), অথবা ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরম্পরা, কৃষ্টি ও মূল্যবোধ ভিত্তিক যে কোনো বিষয়। প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে যদিও এটি সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ প্রান্ত বা রাজ্য স্তরে আঞ্চলিক গুরুত্বের বিষয়ও হতে পারে।

শুধুমাত্র নিজের চর্চাকেন্দ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রান্তস্তরের একক যেমন— মাতৃশক্তি। চারটি পর্যায়ের ছাত্রশক্তি যথা ঊষা, উদয়, উন্মেষ ও উত্তরণ। বিভিন্ন শৈক্ষণীক আয়াম যেমন— ইতিহাস, দর্শন, ভাষা বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতির আন্তর্জালিক/বৈদ্যুতিন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নিজের জ্ঞান চর্চার পরিধি আরও প্রসারিত করা। বলা বাহুল্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা, আমন্ত্রণ অনুসারে সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করা কর্তব্য।

প্রান্তিক স্তরে অনুভব দর্শনে সপরিবারে অংশগ্রহণ করা। অনুভব দর্শন যেন আত্মোপলব্ধি ও আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে লোকপ্রজ্ঞার পতাকাবাহী অনুষ্ঠান। এটি সাধারণত পরম্পরাগত ভাবে ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান যেমন মঠ-মন্দির, তীর্থক্ষেত্র, স্বাধীনতা সংগ্রামী বা দেশমাতৃকার সুসন্তানের স্মৃতি বিজড়িত গৃহ বা অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এবং অবশ্যই প্রজ্ঞাপ্রবাহের জাতীয় কার্যক্রম লোকমন্থনে অনুমতিক্রমে অংশগ্রহণ করা।

লোকপ্রজ্ঞার অনুষ্ঠিত অনুভব দর্শনগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

২০১৮ সালের ১৮ নভেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রারম্ভ। পথ চলা শুরু। অখিল ভারতীয় সংযোজক জগন্নাথ নন্দকুমারজীর উজ্জ্বল উপস্থিতিতে। তদানীন্তন উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজের পৌরোহিত্য ও অভিভাবকত্বে। উপস্থিত ছিলেন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দুটি।

পরের বছর ২০১৯-এর ১৮ মার্চ, দক্ষিণেশ্বর মা ভবতারিণী মন্দির পরিসর ভ্রমণ, দর্শন ও পূজন।

সেবছরেই ৬ আগস্ট, বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগারে (পাবলিক লাইব্রেরি) অনুভব দর্শন ও ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'অমর ভারত অজেয় ভারত' পুস্তক উন্মোচন। অখিল ভারতীয় বৈঠক থাকায়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রজ্ঞা প্রবাহের কার্যকর্তাদের উপস্থিতি।

পরের মাসে ১৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. জগদীশচন্দ্র বসুর স্মৃতি বিজড়িত বসু বিজ্ঞান মন্দির। এই অনুভব দর্শনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বীকৃতি সম্মাননা প্রদান। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রদর্শনী পর্বে তাদের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

পরের অনুভব দর্শনটি ২০২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যেটি লোকপ্রজ্ঞার রাজ্যকার্যালয় মাধব স্মৃতির সন্নিকটে। বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজের আশীর্বচন।

এর পর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বালিগঞ্জ। অতিমারীর আবহে ১৫ মার্চ এটি অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত ভীতি তুচ্ছ করে ৫৫ জন উপনীত হন ভারতমাতার বীর সন্তান যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দের আশ্রমে শ্রদ্ধা নিবেদনে।

অতিমারী আবহে প্রায় এক বছরের ব্যবধানে ২০২১ সালের ২১ মার্চ বৃহদাকারে ত্রিমাত্রিক অনুভব দর্শন। একান্ন সতীপীঠের অন্যতম কালীঘাটে মাতৃ দর্শন। তৎসহ দেশমাতৃকার দুই বীর বঙ্গসন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর গৃহ ৫, এলগিন রোড ও ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পিতৃভিটে দর্শন। স্যার আশুতোষ মুখার্জির স্মৃতি

বিজড়িত।

অতিমারীর প্রভাব সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়ায় প্রায় এক বছরের ব্যবধানে অনুভব দর্শন। ২০২২ সালের ২ জানুয়ারি। এবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত গৃহে পুণ্য ভ্রমণ। রথীন্দ্র মঞ্চে সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুভ সূচনা। অখিল ভারতীয় সংযোজক জগন্নাথ নন্দকুমারজীর উজ্জ্বল উপস্থিতিতে।

অতিমারীর আগ্রাসন নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরবর্তীতে দক্ষিণবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ বিকেন্দ্রীকরণের সূচনাকে স্মরণীয় করে রাখতে পরপর দুটি অনুভব দর্শন। ২০২২ সালের ১ মে দক্ষিণবঙ্গের আয়োজনে একান্ন সতীপীঠের একটি মেদিনীপুরের তমলুকে বর্গভীমা মন্দিরের অনুভব দর্শন। আত্মবলিদানকারী দেশপ্রেমিক সরোজিনী নাইডুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান। আইআইটি খড়্গপুরের প্রখ্যাত নির্দেশক প্র: বীরেন্দ্র কুমার তিওয়ারীর পৌরোহিত্যে। অপরটি সদ্যমান্যতা প্রাপ্ত মধ্যবঙ্গ আয়োজিত অনুভব দর্শন চুঁচুড়ার জোরাঘাটে প্রণবকন্যা আশ্রমে। সকালে গঙ্গাস্নান, তারপরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান। তারপর আশ্রমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এখানে উপস্থিতি আইআইটি খড়্গপুরের খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. পল্লব ব্যানার্জি এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজের আশীর্বচন।

২০২২ সালের ৩১ জুলাই এগারোতম অনুভব দর্শন। আবার প্রারম্ভিক ক্ষেত্র বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিক্ষেত্রে প্রতিটি স্থল এবং প্রাঙ্গণের অনুভব।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে পরবর্তী অনুভব দর্শন। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। লোকপ্রজ্ঞার প্রথম রাত্রিবাস-সহ দু-দিবসীয় অনুষ্ঠান। ছাত্র সংবর্ধনা। চোখে পড়ার মতো মাতৃমণ্ডলী ও ছাত্রদের উপস্থিতি। অধ্যক্ষ স্বামী ইষ্টেশানন্দজীর ভাষণ। উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকারের। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক ভিটে সুভাষগ্রাম ভ্রমণ। এটি দ্বাদশ অনুভব দর্শন।

ত্রয়োদশতম অনুভব দর্শন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের লবণহ্রদ পরিসরে। ২০২৩ সালের প্রথম অনুভব দর্শন। ৩০ এপ্রিল। প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্বতন অখিল ভারতীয় সংযোজক ড. সদানন্দ সাপ্রেজীর উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং অবশ্যই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের নির্দেশক ড. উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। ২০২৩ সালের ১৮ জুন লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য কার্যালয়ের নিকটে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পুনরানুষ্ঠান। এটি চতুর্দশ।

তিন প্রান্ত সহযোগে বৃহদাকারে পঞ্চদশ অনুভব দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তথা মা সারদাময়ীর স্মৃতি বিজড়িত কামারপুকুর ও জয়রামবাটিতে। দুটি পর্বে। প্রথমটি ২০২৩ সালে ২৯-৩০ জুলাই। পরের পর্বটি ২৬-২৭ আগস্ট। বহু বিশিষ্টজনের সমাগম। দুটি পর্ব মিলিয়ে প্রায় পাঁচশোর বেশি প্রজ্ঞাপ্রবাহ সদস্যের অংশগ্রহণ।

বন্দেমাতরমের ধাত্রীভূমি নৈহাটির বঙ্কিম ভবন ও পাঠাগারে মূলত মধ্যবঙ্গের পরিচালনায়। ২০২৩ সালে ১ অক্টোবর। যদিও লোকপ্রজ্ঞার প্রতি অনুষ্ঠানেই বন্দেমাতরম্ স্তোত্র আবশ্যিক, কিন্তু তিন শতাধিক সদস্যের সমবেত কণ্ঠে সমোচ্চারিত পরিবেশনে এক অদ্ভুত অনুভূতি। বঙ্কিম গবেষণা কেন্দ্রের নির্দেশক ও গবেষকদের উপস্থিতি ও ভাষণ গৌরবময় প্রাপ্তি।

২০২৪ সালের দুটি অনুভব দর্শনই ব্যতিক্রমী। একটি এনআইটি দুর্গাপুর। অপরটি আইআইটি খড়্গপুর।

২০২৪ সালের ১৭ মার্চ এনআইটি দুর্গাপুরে 'ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান পরম্পরা' বিষয়ে লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন একটি অসমান্তরাল প্রয়াস। কারণ কোনো এক জাতীয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লোকপ্রজ্ঞার কার্যক্রম এই প্রথম। অতীতে যদিও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানে লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেটি প্রখ্যাত গবেষণা সংস্থা। এনআইটি দুর্গাপুরের নির্দেশক প্র: অরবিন্দ চৌবে এবং ডিন ডঃ পরিমল আচার্যের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

অষ্টাদশতম অনুভব দর্শন বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় কারিগরী সংস্থান বা আইআইটি খড়্গপুরে। নির্দেশক ড. বীরেন্দ্র কুমার তিওয়ারীর পৌরোহিত্যে। অতীতেও বর্গভীমা মন্দিরে তিনি লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন অলংকৃত করেছেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এ রাজ্যের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান। আমন্ত্রিত ছিলেন কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংস্থা এনআইটিটিটিআর কলকাতার নির্দেশক ডঃ দেবী প্রসাদ মিশ্র। ছিলেন ডঃ সদানন্দ সাপ্রে, প্রজ্ঞাপ্রবাহের ভূতপূর্ব অখিল ভারতীয় সংযোজক। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যে সমৃদ্ধ হন।

দুটিতেই লোকপ্রজ্ঞার পক্ষ হতে আসন অলংকৃত করেন ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে।

উনবিংশতি অনুভব দর্শন ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতায়। শুধুমাত্র রাজ্য বা দেশ নয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ও মানের। মহামহিম রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোস মহোদয়ের পথনির্দেশ। মূলত ছাত্রশক্তির কার্যক্রম। সর্ব ভারতীয় যুব কার্যকর্তা ঈশান যোশীর উপস্থিতি ও মনোমুগ্ধকর বক্তব্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্যের ভাষণ। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের স্বামী কালেশানন্দজী মহারাজের আশীর্বচন।

বিংশতিতমটি পুনরায় মা ভবতারিণী মন্দির ঐতিহ্যপূর্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি। প্রায় ছ'বছরের ব্যবধানে। ব্যতিক্রম এই যে এটি সম্পূর্ণ লোকপ্রজ্ঞার মাতৃশক্তি ও সংগীত বিভাগের ব্যবস্থাপনায়। এটি সাংগঠনিক পরিণত মনস্কতার পরিচায়ক। পবিত্র নাটমন্দিরে মন্দির প্রতিষ্ঠাত্রী রানি রাসমণির বংশজ বর্তমান পরিচালন সমিতির কর্ণধার কুশল চৌধুরী, যিনি কিনা লোকপ্রজ্ঞার জন্মলগ্ন থেকে একজন উৎসাহদাতা ও শুভানুধ্যায়ী, তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। তদুপরি, প্রব্রাজিকা আত্মকাণপ্রাণা মাতাজীর আশীর্বচন এবং অবশ্যই মাতৃশক্তি ও সংগীত বিভাগের মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান। একবিংশতি অনুভব দর্শন ঐতিহাসিক রাজভবনে। আগামী ইংরেজি ১৫ মে, ২০২৫। □

প্রসঙ্গ 'সতী নারী'

গত ২৪ মার্চ, ২০২৫ স্বস্তিকা পত্রিকায় অঙ্গনা বিভাগে যশস্বিনী দাশগুপ্তের 'সতী নারী কে?' লেখার সঙ্গে পুরো সহমত পোষণ করতে না পেরে এবং তাঁর স্ববিরোধী কিছু উক্তি হিন্দু তথা সনাতন দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ না হওয়ায় আমার এই পত্রের অবতারণা।

প্রথমত, তিনি লিখেছেন, 'সতী' ও 'পতিব্রতা' শব্দ দু'টি এক নয়। আমরা বহু সময় 'সতী' ও 'পতিব্রতা' শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু 'পতিব্রতা' নারী তাকেই বলা হয়, যিনি নিজের স্বামী ছাড়া কোনদিন দ্বিতীয় পুরুষের কামনা করেননি।

কিন্তু কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পরেই তিনিই আবার লিখেছেন, আমরা যদি পুরাণ ও ইতিহাসের দিকে তাকাই দ্রৌপদী, অহল্যা, মন্দোদরী, কুন্তী, তারা--- ইতিহাস ও পুরাণের এই পাঁচ নারীকে 'পঞ্চকন্যা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই 'পঞ্চকন্যা' ছিলেন পতিব্রতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণা। আবার তাঁরা একাধিক পুরুষের সঙ্গ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আমার বিনীত প্রশ্ন, 'পতিব্রতা' নিয়ে এই প্রকার স্ববিরোধিতা কেন? প্রথমে তিনি লিখলেন, 'পতিব্রতা' নারী তাঁকেই বলা হয়, যিনি নিজের স্বামী ছাড়া কোনদিন দ্বিতীয় পুরুষের কামনা করেন না, আবার তিনিই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পরেই লিখেছেন, 'আবার তাঁরা একাধিক পুরুষের সঙ্গ করেছেন।'

দ্বিতীয়ত, তিনি নিবন্ধটির শেষের দিকে লিখেছেন, 'মানুষ যার সঙ্গে দিনরাত অতিবাহিত করছে, তাকে যদি সে পরমেশ্বর জ্ঞান করে তাহলে সেই মানুষটি কোনো সময়ই পরমেশ্বর থেকে পৃথক হচ্ছেন না। তিনি সকল সময় সেই 'সৎ' এর সঙ্গেই যুক্ত থাকছেন। স্বামীকে ঈশ্বরজ্ঞানে নিত্য সেবা করায় সতী নারীর জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে অনিবার্য মুক্তি ঘটে।'

এখানেই শ্রদ্ধেয়া লেখিকার কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা, কোনো মানুষ দিন-রাত যার সঙ্গে অতিবাহিত করছে, তাকে যদি সে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করে তবে কি তার পক্ষে জন্ম-মৃত্যু চক্র রহিত হওয়া সম্ভব? সনাতন আধ্যাত্মিক দর্শনের অকাট্য সিদ্ধান্ত হলো, কোনো মানুষ যদি কোনো মানুষের প্রতি চরমভাবে আসক্ত হন (তা সে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র- কন্যা বা যে কোনো ব্যক্তি বা জীবজন্তুর প্রতিও হতে পারে), তাহলে আসক্ত ব্যক্তি যার প্রতি আসক্ত ছিলেন—তিনি মৃত্যুর পর যে গতি প্রাপ্ত হবেন– তার প্রতি আসক্ত ব্যক্তিকেও তার মতো একই গতি প্রাপ্ত হতে হবে। কারণ মায়াধীন কোনো ব্যক্তিই ষড়রিপুর প্রাবল্যরহিত তথা জিতেন্দ্রিয় নন। ফলে তারা কেউই শুদ্ধ বা দিব্য ব্যক্তিত্ব নন। তাই তার প্রতি আসক্ত ব্যক্তিও কখনই মায়ার প্রাবল্য মুক্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্র রহিত হতেই পারে না। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মাটি-কাঠ-পাথর বা কোনো ধাতু নির্মিত মূর্তিকে অনন্য ও নিষ্কামভাবে ভগবান জ্ঞানে আরাধনা করেন তবে তিনি অবশ্যই ঈশ্বর প্রাপ্ত হবেন। কারণ কোনো জড় বস্তু সর্বদাই ষড়রিপুর প্রাবল্যমুক্ত মাটি, কাঠ, পাথর বা কোনো প্রকার ধাতুর নির্মিত মূর্তিতে যেহেতু ভগবান বিরাজমান, তাই তিনি ভগবানকে অবশ্যই লাভ করবেন। তাই বলে যদি কোনো ব্যক্তি মাটি বা গোবরের তৈরি লাড্ডুকে ছানা ও চিনির রসগোল্লার ভাবনায় ভাবিত হয়ে মুখে দেন তবে কি তিনি সত্যিকারের রসগোল্লার স্বাদ পাবেন? অবশ্যই না। ওই বস্তুগুলির নির্মিত মূর্তিকে ভগবানের ভাবনা করে উপাসনা করলে যদি ভগবৎ লাভ হয় তবে গোবর বা মাটির তৈরি লাড্ডুতে ছানা-চিনির তৈরি রসগোল্লার স্বাদ পাওয়া যাবে কেন? তার অকাট্য বিজ্ঞান হলো--- ওই বস্তুগুলির মধ্যে ভগবান আছেন সত্য বটে; কিন্তু ভাবনাটাতো শুদ্ধ বা দিব্য নয়। ভাবনাটা জাগতিক বস্তু ছানা-চিনির রসগোল্লার। তাই ভাবনা ও বস্তু উভয়ই যেহেতু শুদ্ধ বা দিব্য নয়, তাই ভগবৎ প্রাপ্তির প্রশ্নই উঠে না। অবশ্য শ্রদ্ধেয়া লেখিকা যদি একথা লিখতেন যে, উল্লিখিত পঞ্চ সতীর প্রত্যেকের স্বামীই তো মহাপুরুষই ছিলেন তাই তাঁদের ভগবৎ প্রাপ্তি হবে বা তাঁরা জন্ম-মৃত্যুচক্র রহিত হবেন। কিন্তু তিনি একবারও সেকথা লেখেননি। তিনি হয়তো বলতে পারেন, একথা আবার লিখতে হবে কেন? ঘোষিত পঞ্চ সতীর তথা তাদের স্বামীদের তো সকলেই জানেন। তার উত্তরে বলবো— না দিদি, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যাঁরা এই নিবন্ধটি পড়বেন—তাঁরা সবাই তাঁদের জানেন না। তাই সনাতন ধর্মের অকাট্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মাতে পারে। আমার এই পত্রের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

—**বিনয়কৃষ্ণ দাশ,**
উত্তমাশা, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর।

বাঙ্গালি আবার কোথায় পালাবে?

ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে পশ্চিমবঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন আন্দোলনে বাঙ্গালিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালিদের ছিল অগ্রণী ভূমিকা। তাই ভারত খণ্ডিত হয়ে যখন স্বাধীনতা লাভ করল তখন প্রথম আঘাত এসেছিল বাঙ্গালিদের উপর। ড. শ্যামাপ্রসাদের দূরদর্শিতায় বঙ্গের একটা অংশ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো। এই পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দু বাঙ্গালিদের হোমল্যান্ড হিসেবে। অর্থাৎ বাঙ্গালি হিন্দুরা এখানে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু বাঙ্গালির কপালপোড়া। বাঙ্গালির বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, পরিশ্রম করার ক্ষমতা আছে, সবই আছে। যেটা নেই তা হলো সংগঠন। বাঙ্গালিরা এক হয়ে চলতে পারে না। আর তার ফলস্বরূপ এই পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়। হিন্দুদের নিজভূমে পরবাসী হতে হয়। দিকে দিকে জায়গায় জায়গায় মার খেতে হয়। আর মার খেয়ে বাঙ্গালিরা পালাতে ওস্তাদ। কিন্তু আর কোথায় পালাবেন? পালাতে পালাতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আর বেশি পালানোর কোনো জায়গা নাই। এবার অন্ততপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। গত কয়েকদিন ধরে মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের বেশ কয়েক জায়গায় ওয়াকফ আইন সংসদে

ফঃ ৩

পাশ হওয়ার বিরোধিতা করে আন্দোলনের নামে হিন্দুদের উপর আক্রমণ, হত্যা, বাড়িঘর ভাঙচুর, দোকানপাট লুঠ, হিন্দু সম্পত্তি লুট, সরকারি সম্পত্তিতে আগুন, হিন্দু মন্দির ভাঙচুর, এমনকী হিন্দুদের ঘরে ঢুকে হিন্দুকে কুপিয়ে হত্যা করা চলছে। আর এই হিংসায় শিশু, মহিলা কেউই পাদ পড়েনি। জেহাদিরা তৃণমূল, সিপিএম কাউকে রেয়াত করেনি। হিন্দুরা রাতের অন্ধকারে গঙ্গা পার হয়ে মালদার পারলালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শরণার্থী হিসেবে থাকতে বাধ্য হয়েছে। রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট জেহাদিরা এই হিংসা ছড়াচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ একপ্রকার দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। কোথাও কোথাও পুলিশও মার খাচ্ছে। যেখানে পুলিশ তার নিজের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ সেখানে সাধারণ মানুষকে কি নিরাপত্তা দিবে?

বর্তমান রাজ্য সরকার গণতন্ত্রকে মানে না, সংবিধান মানে না। ভোটে জেতার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন, ভয় দেখায়। তাই রাজ্যে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে নির্বাচন করাতে হবে। তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। রাষ্ট্রবাদী সরকার গঠন করতে হবে। আর তা না হলে ইতিহাসে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পড়বে পশ্চিমবঙ্গে একসময় হিন্দু বাঙ্গালিদের বাস ছিল।

—**জয়ন্ত চৌধুরী,**
রাজনগর, মালদা।

কোচবিহারে মদনমোহন বাড়ির রাসচক্রের ইতিকথা

আমরা সকলেই জানি কোচবিহারের রাস উৎসব মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের সময়কাল থেকে হয়ে চলেছে। পরবর্তীতে মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের সময়কাল থেকে রাস উৎসব এবং সঙ্গে রাসচক্র ঘোরানো শুরু হয়। একদিন মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ সেই যুগের বিশিষ্ট কাঠ ও বাঁশ শিল্পি প্রাণমামুদ মিঞাকে রাস উৎসবের জন্য একটি রাসচক্র বানাতে বলেন। প্রাণমামুদ মিঞা বহু চেষ্টা করে শিল্পনিপুণতার পরিচয় দিয়ে তিনি লাল ও সাদা রং দিয়ে বাঁশ-কাঠ মিশ্রণ করে ৪৫ ফুট উচ্চতার অষ্টকোণাকৃতির রাসচক্র নির্মাণ করে মহারাজকে দেখান। মহারাজের তা পছন্দ হয়। তখন থেকে রাসচক্রটি মদনমোহন বাড়ি মন্দিরের চত্বরে স্থান পায়। মদনমোহন ঠাকুর দর্শনকারী সকল ভক্ত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রাস উৎসবের সময় প্রতিবছর রাসচক্র হাত দিয়ে ঘুরিয়ে আসছেন। এখনো প্রাণমামুদের বংশধররা তিন পুরুষ ধরে রাসচক্রটি বানিয়ে চলেছেন। বর্তমান বংশধর আমিনুর হোসেন এই কাজটি করছেন । রাসচক্র বানাতে খরচ পড়ে ১৩০০০ টাকা। আমিনুর হোসেন খুবই গরিব। দিনমজুরি করে তার সংসার চলে, বাড়ি নেই বললেই চলে, সরকারি আবাসও জোটেনি। তবুও তিনি খুশি তাদের বংশের তৈরি করা রাসচক্র প্রতিবছর রাস উৎসবে মদনমোহন বাড়িতে স্থান পায়। আজ পর্যন্ত কোনো ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হননি।

—**আলী হোসেন,**
কোচবিহার।

সময়ের আহ্বান

'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।' কবিগুরুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বাণী নিয়েই লোকমান্য তিলক স্বাধীনতা আন্দোলনের তার অভিব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। কর্ণপাত করেনি কেউ। দেশপ্রেমিক রাষ্ট্র তপস্বী ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার পুরোহিত ব্রাহ্মণ সন্তান, যার পরিবারে দারিদ্র নিত্য সঙ্গী। ভীষণ পণ করে এই কাজে ব্রতী হলেন। অতি সাধারণ পরিবারের তরুণ কিশোর বালকদের একত্রিত করে দেশপ্রেমের জয়গান শোনাতে লাগলেন। শরীর মন বুদ্ধি বিকাশের মধ্য দিয়ে শাশ্বত ভারতের ইতিহাস পাঠ করালেন— 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?'

কিন্তু স্বাধীনতা হীনতা এল কেন? চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করতে করতেই এই যুবক ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার আসল রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার বিধান দিলেন। তার মানসসন্তান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শতবর্ষে পদার্পণ করছে। আজ সম্পূর্ণ দেশ ব্যাপী হিন্দু জাগরণ হচ্ছে। সারা বিশ্ব আজ হিন্দুত্বের মহত্ত্ব স্বীকার করছে। যা স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় শিকাগো শহরে উদ্ঘোষ করেছিলেন। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি কী ভয়ংকর তার প্রমাণ ব্রিটিশ অনুসৃত বর্তমান প্রজন্মের কিয়দংশ দেশবিরোধী শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৭৫ বছর মেকলের সন্তানরা এই দুরারোগ্য ব্যধিতে সংক্রমিত। জওহরলাল নেহরু যার প্রবক্তা, বিকৃত ইতিহাসের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় এই গর্হিত কাজ করে চলেছেন। সঙ্ঘ শতবর্ষে পদার্পণ করলেও আমরা দেশবিরোধী এই সংক্রামনজনিত রোগটি দূর করতে পারিনি। স্বয়ংসেবকদের সঙ্ঘের প্রাণ কেন্দ্র সঙ্ঘের শাখা। তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস বলতেন— সঙ্ঘ মানে শাখা, শাখা মানে কার্যক্রম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনে স্বাভাবিকভাবেই অনেক পরিবর্তন। তা সত্ত্বেও মূল ভিত্তি শাখার উপর আগ্রহ বাড়াতেই হবে।

শরীর ও চরিত্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা ও সংস্কার সংগঠনের সফলতাকে পৌঁছে দেবে। হিন্দুত্বের জাগরণ, সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস জানার আগ্রহে রাজনীতির আঙ্গিনাতেও তার প্রকাশ ঘটেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি আজ বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল রূপে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এর ফলে সমাজ জীবনে পজিটিভ রিফর্ম হতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে অহম্ শক্তির প্রকাশ পাচ্ছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠনে অসংস্কারিত ব্যক্তির প্রবেশ চলছে যা খুব অস্বাভাবিক। সম্যক উপলব্ধি করে এখনই সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। আদর্শগতভাবে অবশ্যই বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির সংগঠন অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির সমাজ গঠনের প্রেরণার উৎসস্থল সঙ্ঘ, কিন্তু একটা সম্মানজনক দূরত্ব মেনে চলা উচিত।

—**সুশান্ত পাল,**
সল্টলেক, কলকাতা।

কন্যাসন্তান অলংকার ও অহংকারেরও

মৌ চৌধুরী

একটা সময় ছিল যখন রাজা, জমিদার, উচ্চবিত্ত এমনকী সাধারণ মানুষের ঘরে পুত্রসন্তান হলে মায়ের প্রাপ্য গা ভরতি গহনা আর কন্যা হলে চাবুক বা অবহেলা অপমান। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ছিল। প্রশ্ন ওঠে, এই মনোভাব থেকে কি আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি? এখনো অনেক পরিবার মনে করে পুত্রসন্তান হলে বংশধারা রক্ষিত হবে, তাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আবার কন্যাসন্তান হলে মনের আলো নিভে আসে। ভারতীয় শাস্ত্র অনুসারে সন্তান হলো ভগবানের আর্শীবাদ। কোনো বাড়িতে প্রথম কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে লক্ষ্মী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রথা ছিল। সারদা মা অনেকবারই বলেছেন, সন্তান কন্যা বা পুত্র যাই হোক না কেন, তাকে সমাদরে ও যথাযথভাবে মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে হবে।

সুস্থ সমাজ গড়তে সন্তানের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য বা বিভেদ কাম্য নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মনে করতেন সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে কন্যাসন্তানকে প্রথম থেকেই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাকে বড়ো করতে হবে। উচিত আর অনুচিতের তফাত শুরু থেকেই বোঝানো দরকার। বর্তমান সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তাকে মানিয়ে নিতে শেখাতে হবে। সংসারে সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে নিজের বলে চেনানো খুব প্রয়োজন।

কন্যাসন্তানকে বড়ো করে তুলতে অনেক বেশি যত্নশীল হতে হয়। বিদ্যাসাগরের মতোই সংস্কৃত কলেজের আরেক শিক্ষক গোকুলনাথ শাস্ত্রী সেই কবে বলে গিয়েছেন, নারী সংসার সমাজের বোঝা নয়, তা অলংকার ও অহংকার। তাকে পুরুষের সমমর্যাদা দিতে হবে। নইলে পুরুষেরই মর্যাদা হানি হয়। ভারতীয় আদর্শে মেয়েদের বড়ো করতে হবে । সনাতন ভারত মেয়েদের দেবীর আসনে বসিয়েছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস থাকলে আস্থা আসবেই আর তাতেই ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেতনা লাভ করা যায়। নারী জাগ্রত হলে দেশ জাগ্রত হবে।

সনাতন আদর্শের কঠোর অনুসারী গোকুল চন্দ্র জানান, নারীরাও বেদপাঠ করতে পারে। সব মহাপুরুষই মনে করতেন, নারী অবলা নয়, প্রয়োজনে খড়্গ ধরতে পারে। এছাড়া সেই অমোঘ উক্তি সকলের মনে আছে 'না জাগিলে ভারত ললনা এ ভারত বুঝি জাগে না, জাগে না।'

মনোবিদ ডঃ অভিরূপা সেনগুপ্ত মনে করেন, বেশিরভাগ মেয়ে বয়োসন্ধির সময় মানসিকভাবে কিছুটা অস্থির হয়ে পড়ে। হরমোনের পরিবর্তনের ফলে শরীর গঠনের সময় যা কিনা স্বাভাবিক। এই সময় মা অথবা মাতৃস্থানীয়াদের এগিয়ে আসা দরকার। মেয়ের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করা প্রয়োজন। শরীর ও মনের জাগতিক নিয়মে এই পরিবর্তনের সময় মেয়েরা কিছুটা অকারণে রঙিন কল্পলোকে ভাসতে থাকে আবার অভিমানীও হয়ে পড়ে। বিপথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

মনোবিদদের মতে, এখন প্রায় সব মা শিক্ষিতা, কিন্তু তাদের অনেকের ভেতর স্বার্থপরতা দেখা দিচ্ছে। এর প্রভাব কিন্তু নিজের মেয়ের উপরেও পড়ে। কন্যাসন্তানকে সামগ্রিকভাবে তৈরি করতে হলে এই স্বার্থপরতা ছাড়তে হবে। মেয়েকে ছোটোবেলা থেকেই পরিবেশ, পথে কিছু মানুষের নোংরামো, প্রতিকূল অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, সব দায়িত্ব কি একা মায়ের? পরিবারের অন্যদের কি করণীয় কিছু নেই? সমস্যা হলো পরিবারটাই তো সমাজ ব্যবস্থা থেকে উবে গিয়েছে।

এই চিত্রের বেশিরভাগটাই এই রাজ্যের। গোটা দেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে অনেক জায়গাতেই পরিবার প্রথা টিকে আছে। কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য মা দায়ী এই মনোভাব থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। সবথেকে বড় সমস্যা হলো শ্বশুর বাড়িতে পুত্রবধূকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। শাশুড়ি, বিবাহিতা ননদ, অন্যান্য মহিলা সদস্যরা সবথেকে বেশি অত্যাচারীর ভূমিকা নেয়। নিজেদের সম্মানহানির কথা ভুলে যায়। অথচ এই মহিলরাই কোনো না কোনো পরিবারের কন্যা অথবা বধূ।

তবে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদল হয়েছে। তবু অনেক ক্ষেত্রে শাশুড়ি এখনো পুত্রবধূর শত্রু।

একটি ঘটনা দিয়ে শেষ করব। একজন পুরুষের কন্যা সন্তানের খুব শখ। তাঁর পরপর দুটি পুত্র সন্তানের পর তৃতীয়টি কন্যা হবে ধরে নিয়ে সারাবাড়ি দেওয়ালির মতো সাজানো হয়েছিল। কিন্তু আবার পুত্রসন্তান হওয়ায় তিনি বাড়ি ছেলে চলে গিয়েছিলেন। কন্যাসন্তান আকাঙ্ক্ষিত এই মানুষটি অনেকদিন স্ত্রীর সঙ্গে অনাবশ্যক কথা বন্ধ রেখেছিলেন। ঘটনা হলো তাঁর চতুর্থবার সন্তান জন্মের আগে কন্যাসন্তান কামনার্থে বহু দেবতার নামে মানসিক করা হলো, পারিবারিক গুরুদেব এসে বসে রইলেন। তাবিজ কবজ ধারণ করা হলো, কন্যাসন্তানের নামও স্থির করা হলো। কিন্তু চতুর্থবারও ঘরে এল পুত্রসন্তান। চার পুত্রসন্তানের জনককে বহু কষ্টে বিবাগী হওয়া থেকে আটকানো গিয়েছিল। ▫

বেদনানাশক যখন বেদনার কারণ

ডাঃ বলরাম পাল

বর্তমান সময়ে হাতের কাছে নানাবিধ বেদনানাশক ওষুধ থাকায় আমরা কারণে অকারণে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করে ফেলছি যা ক্ষণিকের জন্য স্বস্তি দিলেও দীর্ঘমেয়াদে বিপদ ডেকে আনতে পারে। সাধারণত বাজারে প্যারাসিটামল, NSAID (নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ) গোত্রের ওষুধ, যেমন—ডাইক্লোফেনাক, অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন, ন্যাপ্রোক্সেন এবং Opioid (আফিম- সদৃশ ব্যথানাশক) পাওয়া যায়। এই ওষুধগুলো ব্যথা কমানোর পাশাপাশি প্রদাহও কমায়।

বেদনানাশক কীভাবে কাজ করে ঃ

প্যারাসিটামল ও মেরুদণ্ডের (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র) কক্স বা সাইক্লোঅক্সিজিনেজ এনজাইমগুলিকে ব্লক করেও কাজ করে বলে মনে করা হয়। প্যারাসিটামল ব্যথার চিকিৎসা এবং উচ্চ তাপমাত্রা কমাতে ব্যবহৃত হয় ঠিকই তবে এটি প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন কমাতে সাহায্য করে না।

NSAID (নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ) সাইক্লো- অক্সিজিনেজ (COX) নামক এনজাইমের প্রভাবকে প্রতিরোধ করে। আবার COX প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন নামক অন্যান্য রাসায়নিক তৈরিতে সাহায্য করে। এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনগুলি আঘাত বা ক্ষতির স্থানে ব্যথা ও প্রদাহ অনুভূতির কারণ। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন উৎপাদন হ্রাস পেলে ব্যথা ও প্রদাহ উভয়ই হ্রাস পায়।

Opioid কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, অন্ত্র ও শরীরের অন্যান্য অংশে নির্দিষ্ট রিসেপ্টরগুলির সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে কাজ করে। এর ফলে ব্যথার অনুভূতি হ্রাস পায় এবং ব্যথার সহনশীলতা বৃদ্ধি করে।

বেদনানাশক ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঃ

প্যারাসিটামল– এটি একটি নিরাপদ ওষুধ। এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই বিরল। তবে, প্যারাসিটামল যদি খুব বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে লিভারকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

NSAID--- এই গোত্রের ওষুধ স্বল্পমেয়াদে গ্রহণ করলে খুব একটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না অথবা হলেও সামান্য হয়। এই ওষুধ সঠিকভাবে গ্রহণ করলে ক্ষতির চেয়ে উপকারিতা অনেক বেশি।

Opioid– এই গোত্রের ওষুধ ব্যবহার করলে তন্দ্রাচ্ছন্নতা বা ঝিমুনি আসে, অসুস্থ বোধ করার সঙ্গে বমি বমি ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখগহ্বর, জিভ শুষ্ক অনুভূত হয়।

অতিরিক্ত বেদনানাশক শরীরের কী কী ক্ষতি করতে পারে ঃ

ব্যথা উপশমকারী ওষুধ, বিশেষ করে প্যারাসিটামল লিভারের ক্ষতি করতে পারে। তাই, প্যারাসিটামল পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই প্যারাসিটামল খেতে হবে।

আইবুপ্রোফেন, অ্যাসপিরিন এবং ন্যাপ্রোক্সেন গ্রহণের ফলে পেটে ব্যথা, জ্বালা করা এবং অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে। এমনকী ব্যথানাশক ওষুধ গ্রহণের কারণে পেটে আলসারও হতে পারে। আর যাদের আগে থেকেই আলসার আছে, তাদের রক্তপাত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে।

বেদনানাশক ওষুধ ডিপ্রেশনের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের কার্যকারিতা হ্রাস করে। যারা অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করেন, তাদের বেদনানাশক ওষুধ এড়িয়ে চলা উচিত।

উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীরা বেদনানাশক ওষুধ গ্রহণ করলে কিডনির মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে এবং এর থেকে কিডনি ফেইলিওর হতে পারে।

গর্ভাবস্থার প্রথম ২০ সপ্তাহে বেদনানাশক ব্যবহার করলে গর্ভপাত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়।

অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন ও ন্যাপ্রোক্সেন রক্ত পাতলা করে। যাদের রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা এবং হার্টের সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধগুলো উপকারী। কিন্তু যারা রক্ত পাতলা করার ওষুধ খান তাদের এধরনের ওষুধ এড়িয়ে চলা উচিত। এতে রক্ত অতিরিক্ত পাতলা হয়ে অত্যাধিক রক্তপাত হতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, NSAID হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ২০ থেকে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। পরিশেষে বলি ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ ব্যতিরেকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বেদনানাশক ওষুধ না খাওয়াই ভালো। এতে করে আমরা অজান্তেই নিজেদের ক্ষতি করে ফেলতে পারি এবং তখন বেদনানাশকই বেদনার কারণ হয়ে উঠতে পারে। □

কলকাতায় স্বস্তিকা পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ১২ এপ্রিল কলকাতার হাতিবাগানস্থিত আস্থা চিলড্রেনস্ অডিটোরিয়ামে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং স্বস্তিকা প্রকাশনার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান। বিকাল ৫ টায় সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের দ্বারা আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. আশিস গিরি, প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী সৌরভ ঘোষ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার নির্দেশক অরিন্দম সিংহরায়। এদিনের মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী।

প্রচার প্রতিনিধি বৈঠক

সংস্কার ভারতীর সংগীতানুষ্ঠানের পর সভাপতি, প্রধান অতিথি ও মুখ্য বক্তা ভারতমাতা এবং বঙ্গাব্দের প্রবর্তক মহারাজা শশাঙ্কের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বস্তিকার নির্দেশক অরিন্দম সিংহরায়। স্বস্তিকা পত্রিকা প্রবীণ প্রথিতযশা লেখকদের পাশাপাশি নবীন লেখকদের জন্য জায়গা করে দেয়। কচিকাঁচাদের জন্য নবাঙ্কুর বিভাগে লেখার সুযোগ থাকে। এবছর সেই বিভাগে সর্বাধিক অংশগ্রহণের জন্য কলকাতার লেকটাউনের নবম শ্রেণীর ছাত্রী রূপসা রায়কে সংবর্ধনা জানানো হয়। বিশিষ্ট লেখিকা দেবযানী ভট্টাচার্য ও ড. রাজলক্ষ্মী বসু ছোট্ট রূপসার গলায় উত্তরীয় পরিয়ে হাতে পুষ্পস্তবক ও উপহার তুলে দেন।

এরপর মঞ্চস্থ অতিথিবর্গ বঙ্গীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে সঙ্ঘ শতবর্ষের উপর বিভিন্ন পুরাতন, নতুন লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ এবং প্রয়াত তিন কার্যকর্তার পূর্বলিখিত প্রবন্ধ সংবলিত পত্রিকাটির উন্মোচন করেন। নববর্ষ সংখ্যা-সহ তিনটি সংখ্যায় সঙ্ঘ ও বিবিধক্ষেত্রের বঙ্গ প্রদেশের ইতিবৃত্ত প্রকাশের বিষয়টিও ঘোষণা করা হয়। এই বছরের লেখক সম্মাননা প্রদান করা হয় প্রবীণ সাংবাদিক তথা বিশিষ্ট লেখক দুর্গাপদ ঘোষ মহাশয়কে। উত্তরীয়, মিষ্টান্ন, পঞ্চফল, শাল, পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের সংবলিত মানপত্রটি বিশিষ্ট আইনজীবী অভিজিৎ চক্রবর্তী পাঠ করে শোনানোর পর লেখকের হাতে তুলে দেন।

এরপর প্রধান অতিথি সৌরভ ঘোষ এবং সভাপতি ড. আশিস গিরি বঙ্গাব্দ তথা বাংলা ভাষার প্রসঙ্গকে তাদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। এরপর তনুশ্রী মল্লিকের একক গানের পর অনুষ্ঠানের মূল বক্তা সুনীলপদ গোস্বামী সঙ্ঘ শতবর্ষের বিভিন্ন ঘটনা তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন। স্বস্তিকার প্রকাশক সারদাপ্রসাদ পাল অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বস্তিকার বহু বিশিষ্ট লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে আলাদা মাত্রা যোগ করে। বিশেষ উল্লেখ্য, এদিন ওই স্থানেই সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধিদের বৈঠক আয়োজিত হয়।

সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠান ও মহারাজা শশাঙ্কের মূর্তি স্থাপন

গত ৮ এপ্রিল কলকাতা-স্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অডিটোরিয়ামে সংঘটিত হলো 'সংস্কার ভারতী' আয়োজিত এবং 'ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস' নিবেদিত 'নববর্ষ আবাহন উৎসব ও সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর' লোকার্পণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা 'মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ' ও 'পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র'।

বঙ্গের পুরাতন ঐতিহ্যকে স্মরণ করে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে একটি বর্ণাঢ্য 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' মঙ্গলঘট, কুলো, চামর, গৈরিক পতাকা হাতে শঙ্খধ্বনি-সহ মন্দিরার তালে তালে সংস্কার ভারতীর লালপাড়, সাদাশাড়ি পরিহিতা শতাধিক শিল্পীসদস্যা বর্ষবরণের গান গাইতে গাইতে গৌড়ীয় নৃত্য-সহ জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিসর পরিভ্রমণ করেন। শোভাযাত্রার শেষে ভাষা ভবনের সম্মুখে সংস্কার ভারতীর চিত্রশিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত বঙ্গাব্দের প্রবর্তক মহারাজা শশাঙ্কের শাসনকালের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উপর অঙ্কিত ১৩টি চিত্র সমন্বিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ ও এই ইনস্টিটিউটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী।

বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনে শতাধিক কণ্ঠে পরিবেশিত হয় সংস্থার ভাব সংগীত 'সাধয়তে সংস্কার ভারতী' এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গান দুটি। মহারাজা শশাঙ্কের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে নববর্ষ আবাহন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উদ্বোধক ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ ও অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি, বিশিষ্ট সমাজসেবী ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, উচ্চাঙ্গ সংগীত সাধক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাসের অছি সুভাষ ভট্টাচার্য এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্লব রায়। এই অনুষ্ঠানে নীলাঞ্জনা রায় সংস্কার ভারতীর দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশের ইতিকথা বলতে গিয়ে জানান যে, ২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচিত্রশিল্পী, বর্তমানে 'সংস্কার ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ'-এর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের মুখ্য উপদেষ্টা পদ্মভূষণ ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায় সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সংস্থার শিল্পীসদস্যারা গবেষণামূলক এই দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশের পরম্পরাটি আজও বজায় রেখেছেন। এবারের দেওয়ালপঞ্জীর বিষয়— গৌড়েশ্বর মহারাজা শশাঙ্কের বীরগাথা। সংস্কার ভারতীর চিত্রশিল্পীবন্ধুদের দ্বারা অঙ্কিত মহারাজা শশাঙ্কের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উপর ১২টি চিত্র নিয়ে সজ্জিত এই দেওয়ালপঞ্জী।

অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী বলেন, মহারাজা শশাঙ্ক সম্বন্ধে তথাকথিত ঐতিহাসিকরা নির্লিপ্ত থাকলেও বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে তথ্য তুলে ধরেছেন, তার থেকে জানা যায় যে তিনি বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না। মহারাজা শশাঙ্ককে যেভাবে বৌদ্ধবিদ্বেষী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, তা সত্যি নয়।

ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ বলেন, গুপ্ত রাজাদের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে শশাঙ্কের আবির্ভাব, তিনি ভগবান শিবের উপাসক

ছিলেন। মূলত হুনদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁকে অবশ্যই বাঙ্গালির আইডল ভাবা যেতে পারে। মহারাজা শশাঙ্ক শুধুমাত্র গৌড়ের রাজা ছিলেন না, তাঁর রাজত্ব বিস্তারলাভ করেছিল বিহারের কিয়দংশ পর্যন্ত। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক শশাঙ্ককে উপেক্ষা করলেও ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। তিনি আরও বলেন, ঐতিহাসিকদের মতে মহারাজা শশাঙ্ক ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন। তাঁর সিংহাসন আরোহণের দিন থেকেই বঙ্গাব্দের সূচনা। পক্ষান্তরে, মুঘল বাদশা আকবর বঙ্গাব্দের প্রবর্তক ছিলেন— বামপন্থী ঐতিহাসিকদের এই দাবি সত্য নয়। বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হলেন মহারাজা শশাঙ্ক। সাল-তারিখ গণনা করলে এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি বলেন, 'আজ থেকে ১৪৩২ বছর আগে মহারাজা শশাঙ্ক বাঙ্গালির জন্য যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তা অনুসরণযোগ্য। মহারাজা শশাঙ্ক সনাতন ধর্মের অনুগামী হওয়ার কারণে খুব সম্ভবত ঐতিহাসিকরা তাঁর সম্পর্কে নির্লিপ্ত ছিলেন।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'বঙ্গীয় সংস্কৃতি কোনো আরবি সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রিত সংস্কৃতি নয়, যেটা এখন আমাদের প্রতিবেশী দেশ তুলে ধরার চেষ্টা করছে। বঙ্গীয় সংস্কৃতি মহারাজা শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সংস্কৃতি। আর সংস্কার ভারতী সেই সংস্কৃতিকেই তুলে ধরার জন্য কাজ করে চলেছে। এরপরই সভায় উন্মোচিত হয় শিল্পী শীর্ষ আচার্য নির্মিত মহারাজা শশাঙ্কের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি। সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বুকে এটিই প্রথম মহারাজা শশাঙ্কের মূর্তি। শঙ্খধ্বনি ও জয়ধ্বনি সহযোগে মালা পরিয়ে মূর্তিটিকে সভায় স্থাপন করা হয়। এই সময় আশিস গিরি ঘোষণা করেন যে, এই মূর্তিটিকে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রদর্শন কক্ষে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা হবে এবং একটি কিউআর কোড দেওয়া থাকবে যেটি স্ক্যান করলে মহারাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

এরপর মহারাজা শশাঙ্কের বীরগাথা অবলম্বন করে ১৪৩২ বঙ্গাব্দের সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিরা। মহারাজা শশাঙ্কের জীবনের ১২টি অধ্যায়কে অবলম্বন করে ১২টি চিত্র অঙ্কন করেছেন সংস্কার ভারতীর সুদক্ষ শিল্পীরা। এরপর সংস্থার কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন, 'বাঙ্গালি জাতিসত্তার প্রতীক মহারাজা শশাঙ্ককে নিয়ে এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে আমরা খুব আনন্দিত। ১৪১২ বঙ্গাব্দ থেকে আমরা প্রতি বছর নতুন নতুন বিষয় নিয়ে দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশ করছি। এবারের বিষয় মহারাজা শশাঙ্কের বীরগাথা। মহারাজা শশাঙ্কের আদর্শ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক, গৌড়াধিপতি মহারাজা শশাঙ্কের মতো বীর বাঙ্গালির ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করুক।' এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে রাষ্ট্রগান 'বন্দে মাতরম্'-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় পর্বে মঞ্চস্থ হয় মহারাজা শশাঙ্কের জীবন অবলম্বনে নাটক 'মহারাজা শশাঙ্ক'। পশ্চিমবঙ্গের বুকে মহারাজা শশাঙ্কের উপর রচিত প্রথম নাটক 'মহানায়ক শশাঙ্ক' অভিনীত হয় ১৩৬২ বঙ্গাব্দে। নাট্যকার ছিলেন ধীরেন মিত্র। তারপর কয়েক দশক পরে এটি ছিল মহারাজা শশাঙ্কের জীবনী আধারিত দ্বিতীয় নাটক। নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন কল্লোল ভট্টাচার্য, প্রযোজনা— 'এবং আমরা' সাতকাহানিয়া, পশ্চিম বর্ধমান। নাটকটির বিন্যাস, প্রয়োগ কুশলতা ও অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সুদীপ বসু।

ডিসি নর্থ অফিসে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের ডেপুটেশন কার্যক্রম

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে সনাতনী হিন্দুদের উপর বর্বর, জেহাদি আক্রমণ ও হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে গত ১৭ এপ্রিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দল, উত্তর কলকাতা জেলার উদ্যোগে একটি প্রতিবাদী পদযাত্রা ও ডিসি নর্থ (কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার, উত্তর কলকাতা) অফিসে ডেপুটেশন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রা ও ডেপুটেশন কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর কলকাতা বিভাগ সংগঠন সম্পাদক অনির্বাণ ভট্টাচার্য, পরিষদের উত্তর কলকাতা জেলা সহ-সভাপতি সুনন্দা রায়, জেলা সম্পাদক অভিজিৎ চৌধুরী, জেলা সেবা প্রমুখ রাজা দে, জেলা ধর্ম প্রসার প্রমুখ শঙ্কর দে, বজরঙ্গ দলের উত্তর কলকাতা জেলার সহ-সংযোজক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের উত্তর কলকাতা জেলার অন্যান্য কার্যকর্তারা। পদযাত্রা ও ডেপুটেশন কার্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হিন্দুদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ও জেহাদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন সকলেই। তাঁরা বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বর্তমানে চলছে হিন্দুদের বাঁচার লড়াই। ধর্ম ও হিন্দুদের আত্মসম্মান বাঁচাতে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহত থাকবে এই লড়াই।

দক্ষিণেশ্বরে লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান

গত ৩১ মার্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার ২০তম অনুভব দর্শন অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী মন্দির প্রাঙ্গণে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্মরণে যৌথভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে লোকপ্রজ্ঞা মাতৃশক্তি এবং লোকপ্রজ্ঞা সংগীত। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির ও দেবোত্তর এস্টেটের অছি পরিষদের সম্পাদক কুশল চৌধুরীর একান্ত অনুগ্রহে এবং তুহিনা প্রকাশনীর কর্ণধার হিমাংশু মাইতি, মন্দিরের অছি দেবব্রত রায়, অছি পরিষদের অন্যান্য সদস্য এবং নিরাপত্তা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের সংকল্প সূত্রটি ছিল— স্বামীজীর ধ্যানদৃষ্ট পরম বৈভবশালী ভারতবর্ষকে বাস্তবে রূপদানের জন্য মাতৃশক্তির চেতনার কী রূপ জাগ্রত হলে তাদের লালিত পালিত সন্তানেরা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক জীবন যাপন করে এই শুভ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে। এই সংকল্প সূত্রটি রচনা করেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অরবিন্দ দাস। অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন শ্রী সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী ও সারদা মঠের মুখপত্র নিবোধত পত্রিকার সম্পাদিকা পূজনীয়া প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা মাতাজী। প্রদীপ প্রজ্বলন, বৈদিক মন্ত্রপাঠ এবং উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন মধ্যবঙ্গ সহ-মাতৃশক্তি প্রমুখ ডাঃ রেবা মণ্ডল। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'কে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃশক্তি জাগরণের যে রসায়ন তৈরি করেন, সেই রসায়ন বিজ্ঞানের সমস্ত সূত্রগুলি পরপর ব্যাখ্যা করেন পূজনীয়া মাতাজী। তাঁর বক্তব্যের শিরোনাম ছিল— 'মাতৃশক্তির জাগরণে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর অবদান'। নারীদের যোগ্য সম্মান প্রদর্শন, নারী-পুরুষের ভেদ দূরীকরণ, নারী গুরু গ্রহণ, সারদা পূজা, গোপীভাবের সাধন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। মাতৃশক্তির চেতনা জাগরণের প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োগ ব্যবস্থা শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের অনন্যতার বিষয়টি মাতাজী তাঁর বক্তব্যে বিশেষভাবে তুলে ধরেন। মধ্যে ছিল লোকপ্রজ্ঞা সংগীতশিল্পীদের শ্যামা সংগীত, ভক্তিগীতি পরিবেশন। আকর্ষণীয় ছিল টুম্পাদির কণ্ঠে স্বামীজী রচিত 'কালী দ্য মাদার'-এর বঙ্গানুবাদ 'মৃত্যু রূপা মাতা'র আবৃত্তি, ক্রিয়েটিভ অ্যাকাডেমি হলদিয়ার সদস্যের দ্বারা সংগীতের তালে তালে যোগপ্রদর্শন। বালিকার দুর্গা নৃত্য, বালকের গীতা পাঠ, শ্রীমতী বলাকা মিস্ত্রির শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব প্রসঙ্গ। মা ভবতারিণী মন্দিরের অছি পরিষদের সম্পাদক কুশল চৌধুরী রানি রাসমণির দেশপ্রেম, শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন, সারদা মায়ের ত্যাগ, স্বামীজীর বৈদান্তিক জাতীয়তাবাদের বার্তা শুনিয়েছেন। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ধর্মের পুনর্জাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা তুলে ধরে সমগ্র জাতিকে স্বধর্মে ব্রতী হওয়ার জন্য জাগরণের ডাক দেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান, মধ্যবঙ্গ মাতৃশক্তি প্রমুখ ড. সুমিতা বটব্যাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' গান শোনান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের

প্রদান, উত্তরবঙ্গ মাতৃশক্তি প্রমুখ ড. অঙ্কিতা মুখোপাধ্যায়। সবার কল্যাণ প্রার্থনায় কল্যাণ মন্ত্র 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' উচ্চারণ করেন স্বপ্না গলুই।

এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই চলতে থাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তাৎক্ষণিক মূর্তি নির্মাণ। মূর্তি নির্মাণ করেন মৃৎশিল্পী সঞ্জীব মণ্ডল ও তাঁর পুত্র সুপ্রসন্ন মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন মোট ৩৩৪ জন, যাঁদের মধ্যে ১৫৪ জন মহিলা ও ৮৫ জন ছাত্রী। সমস্ত প্রতিনিধির কাছে অন্তিম আকর্ষণ ছিল মা ভবতারিণীকে দর্শনের ব্যবস্থা, পূজার আয়োজন, বিভিন্ন সুস্বাদু অন্নব্যাঞ্জন সহযোগে প্রসাদ গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা। উপস্থিত প্রবুদ্ধ জনের মধ্যে ছিলেন স্বস্তিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, বিদ্বান ব্যক্তিত্ব সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য সংযোজক ড. সোমশুভ্র গুপ্ত, উত্তরবঙ্গ সংযোজক ড. সুমন পাণিগ্রাহী, মধ্যবঙ্গ সংযোজক মনোরঞ্জন হাজরা, সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. অনিল ঘোষ, প্রজ্ঞাভাষ্য প্রমুখ অনির্বাণ দে ও আরও অনেকে। এই অনুষ্ঠানের পরমপ্রাপ্তি হলো এক আত্মনির্ভর মাতৃশক্তি। দীপমালাদি, মৌমিতাদি, কাকলিদি, মমতাদি, রিমাদির সুসমন্বিত সঞ্চালনায় এই অনুষ্ঠানে নবীন-প্রবীণদের মেলবন্ধন ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুঘটক ছিলেন মধ্যবঙ্গ সহ-সংযোজক মিলন দে। সংগীত নির্বাচনের দায়িত্ব সামলান পারমিতাদি, মিন্টু দা, সঙ্ঘমিত্রাদি, দীপমালাদি। প্রতিনিধি সংগ্রহ ও পঞ্জীকরণ ব্যবস্থার গুরুদায়িত্ব সামলান দক্ষিণবঙ্গের সহ-মাতৃশক্তি প্রমুখ স্বাগতা মাইতি ও যুব সংগঠক পুষ্পেন্দু কুণ্ডু। অনুষ্ঠানের সমন্বয় সূত্রটি ধরেছিলেন রাজ্য সম্পর্ক প্রমুখ ড. আশিস কুমার মণ্ডল। সংগঠনের দৃঢ় পদক্ষেপ এবং নতুন প্রবুদ্ধ জনের আগমন সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে চলার পাথেয়। সমগর কার্যকারণ সম্পর্ক এবং সাফল্যের পিছনে 'অঘটন ঘটন পটীয়সী' মা ভবতারিণীর অশেষ কৃপা, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আশীর্বাদ এবং দক্ষ সংগঠকদের পুরস্কার। সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধিতে মাতৃশক্তির প্রয়াস ও জনগণের সহযোগিতাও বিশেষ প্রার্থনীয়।

সুন্দরবনের বাসন্তীতে গ্রাম বিকাশ গতিবিধির উদ্যোগে ভূমি সুপোষণের কার্যক্রম

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর গদখালিতে গ্রাম বিকাশ গতিবিধির উদ্যোগে গত ১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় ভূমি সুপোষণের কার্যক্রম। গ্রামের মাঝখানে সর্বজনীন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এই কার্যক্রম। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত পূজায় অংশগ্রহণ করেছিলেন

১২ জন দম্পতির সঙ্গে চার জন মহিলা ও ২ জন পুরুষ। উপস্থিত ছিলেন গ্রামের সজ্জন ব্যক্তি, মাতা-ভগিনী-সহ ১০০ জন গ্রামবাসী, প্রান্ত গ্রাম বিকাশ সংযোজক দুলালচন্দ্র নস্কর, সঙ্ঘের জেলা শারীরিক প্রমুখ গৌতম মণ্ডল, জেলা গ্রাম বিকাশ সংযোজক সুকুমার বাগ, গ্রাম বিকাশের গ্রাম প্রমুখ ভরত কুমার দাস, জেলা সহ-শারীরিক প্রমুখ গোপাল হালদার এবং আরও অন্যান্য কার্যকর্তা। রঙ্গোলি দিয়ে পূজার স্থানটিকে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। তার আগে মায়েরা গোবরজল দিয়ে স্থানটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছিলেন। অনুষ্ঠানস্থলে চার ধারে কলাগাছ, আম্রপল্লব, ডাব-সহ ঘট স্থাপন করা হয়। মাঝখানে একটি শালু কাপড় রাখা হয়েছিল। সকলে নিজের নিজের জমির মাটি পূজা করে নিয়ে এসেছিলেন এবং এই শালু কাপড়ে সকলে মাটি রেখে তামার একটি বড়ো ঘট ডাব ও আম্রপল্লব-সহ সাজিয়েছিলেন। পূজার সময়ে হরিনাম সংকীর্তনের দল ছিল। হরিকীর্তনের মাধ্যমে পূজা হয়। গোমাতা ও বাছুরকেও পূজা করা হয় এবং গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে গোমাতাকে সকলে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করেন। ভূমি সুপোষণ সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য রাখেন গ্রাম বিকাশ সংযোজক দুলালদা। উপস্থিত সকলকে সংকল্পবাক্য পাঠ করানো হয়। পূজা শেষে প্রসাদ হিসেবে চিড়া-বাতাসা, ফল ও খিচুড়ি সকলকে বিতরণ করা হয়।

'সক্ষম, দক্ষিণবঙ্গ'-এর প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বিগত ৩০ মার্চ, কলকাতায় বনহুগলী-স্থিত এনআইএলডি ইনস্টিটিউটে সক্ষম, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮টি জেলার ৫৬ জন প্রতিনিধি এই প্রশিক্ষণ বর্গে অংশগ্রহণ করেন। এনআইএলডি-র সহযোগিতায় এই কর্মসূচি সুসম্পন্ন হয়। উলুবেড়িয়ার আশাভবনও এই কর্মসূচিতে যোগ দেয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সক্ষম, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম-সহ সংগঠনের অন্যান্য পদাধিকারী এবং এনআইএলডি-র অধিকর্তা ডাঃ ললিত নারায়ণ-সহ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপকমণ্ডলী।

ফঃ ৪

কলকাতা মহানগরীর বুকে মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে বঙ্গীয় নববর্ষ উদ্‌যাপন

গত ১৫ এপ্রিল দিনটি ছিল ১৪৩২ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ। বঙ্গীয় নববর্ষের প্রথম দিনের শুভলগ্নে 'বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদ' ও 'বাংলা আবার'-এর যৌথ উদ্যোগে এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগিতায় কলকাতা-স্থিত রবীন্দ্র সদনের বিপরীতে মোহরকুঞ্জের সামনে থেকে শুরু হয় একটি বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা। ধ্বজ, মঙ্গলঘট, ঢাক-ঢোল, শ্রীখোল, করতাল, মন্দিরা, চামর, গৌড়ীয় নৃত্য ও কীর্তন সহযোগে আয়োজিত এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন অসংখ্য সনাতন সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। নতুন বছরের প্রথম দিনের অপরাহ্ণে অগণিত মানুষ সুবেশে, সৌকর্যে, সনাতনী সংস্কৃতির মঙ্গলালোকে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় যোগদানের মাধ্যমে কলকাতা মহানগরীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রা থেকে মুহুর্মুহু স্লোগান ওঠে--- 'জয় বঙ্গ জয় শশাঙ্ক'। একই চিন্তাধারার পথিক সনাতনীদের সম্মিলিত স্লোগানে, গানে, কীর্তনে, বাদ্যযন্ত্রে, সাংস্কৃতিক সজ্জায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যাত্রাপথ। পথচলতি মানুষেরা তাঁদের সাধুবাদ জানান। শোভাযাত্রার ছবি ও ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অগণিত সনাতনীর এই সম্মিলিত পদযাত্রার মাধ্যমে ইতিহাস ও সংস্কৃতি-সচেতনতার বার্তা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এদিন পৌঁছে যায়।

বাঙ্গালির কয়েক হাজার বছরের সংস্কৃতি দীর্ঘজীবী হোক--- এটিই ছিল এই শোভাযাত্রার মূল উদ্দেশ্য। বাঙ্গালি সংস্কৃতি বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ, তার যথার্থ ইতিহাস প্রকাশিত হোক— এই প্রত্যয় নিয়েই এদিন পথে নেমেছিলেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক প্রবর্তিত বঙ্গাব্দের ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধানে প্রয়াসী রয়েছে বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদ। বহু বছর ধরে বাঙ্গালিকে ভুলিয়ে দেওয়া বঙ্গাব্দের প্রকৃত ইতিহাস। বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসেবে মহারাজ শশাঙ্ককে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালি সংস্কৃতির সত্য ইতিহাস উন্মোচিত হোক এবং মুর্শিদাবাদ জেলার নাম পরিবর্তন করে 'কর্ণসুবর্ণ' রাখা হোক— এই দুটি দাবি এদিনের শোভাযাত্রা থেকে উত্থাপিত হয়। শোভাযাত্রার মাঝে রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে নানা কসরৎ দেখান কয়েকজন নাট্যকর্মী।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কুমারী উপনয়ন অনুষ্ঠান

গত ৭ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার অন্তর্গত কালিন্দী গ্রামে জ্যোতির্বিদ শিবপদ আচার্যের ঘরে অনুষ্ঠিত হলো দুই কুমারীর উপনয়ন। শিবপদবাবু দীর্ঘদিন জ্যোতিষচর্চা-সহ নানান বৈদিক অনুষ্ঠান করে থাকেন। সেই প্রেরণা থেকে উপলব্ধি করেন যে, সংস্কার নারী-পুরুষ সবার জন্য হওয়া উচিত। তাঁর একমাত্র নাতি কেশবের উপনয়ন স্থির হওয়ার পর তিনি তাঁর দুই নাতনি সুদেষ্ণা ও বিপাশার উপনয়ন দানে ব্রতী হন। ছোটোবেলা থেকেই নাতি- নাতনিদের নানান বৈদিক মন্ত্র নিজে শিখিয়েছেন। নাতনিদের আগ্রহও ছিল তুঙ্গে। কিছু পারিবারিক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের বিরূপ প্রশ্নে তিনি সাময়িক বিচলিত হলেও আর্য সমাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও শক্তিবাদ মহামণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্টজনদের দেওয়া যুক্তি, পরামর্শ ও সহযোগিতায় তাঁর সিদ্ধান্তেই অটল থাকেন এবং যথারীতি পত্র দ্বারা আত্মীয়-পরিজনদের উপনয়ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর কুলাচার অনুযায়ী প্রত্যুষে নবগ্রহ পূজা ও যজ্ঞ সমাপনান্তে

একদিকে শুরু হয় পৌত্র শ্রীমান কেশবের উপনয়ন সংস্কার, এবং পাশেই আর্য সমাজের পণ্ডিতদের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয় পৌত্রীদ্বয় কুমারী সুদেষ্ণা ও বিপাশার উপনয়ন সংস্কার। আর্য সমাজের পণ্ডিত ড. অপূর্ব দেবশর্মা বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করে শোনান। ব্রহ্মচারিণীদ্বয়, তাঁদের মা, বাবা, ঠাকুরদাদা ও এই অনুষ্ঠানের আয়োজক শিবপদ আচার্য এবং উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে থাকেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই বৈদিক সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। আশেপাশের গ্রামবাসীদের উপরেও এই শুভ অনুষ্ঠানটির প্রভাব প্রবলভাবে পড়ে।

বিজয়গড়ে জয়শ্রী পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ অনুষ্ঠান

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণায় ১৯৩১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় জয়শ্রী পত্রিকা। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা হলেন বিপ্লবী, দেশনেত্রী লীলা রায়। ১৯৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলন, ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থা ইত্যাদি নানা কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও গত প্রায় ৯৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী এই মাসিক পত্রিকাটি।

২০২০-২১ সালে কোভিড মহামারীর পর্যায়ে পত্রিকাটির প্রকাশ হয়ে পড়ে অনিয়মিত। ২০২১ সালের জানুয়ারি সংখ্যাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এই বছরের মার্চ পর্যন্ত পত্রিকাটির কোনো মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। সব বাধা-বিপদকে জয় করে গত ১৫ এপ্রিল, বঙ্গীয় নববর্ষের দিন দক্ষিণ কলকাতায় বিজয়গড়ে নেতাজী চর্চাকেন্দ্রে 'www.jayasreepatrika.net'- শীর্ষক ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে জয়শ্রী পুনঃপ্রকাশিত হলো। জয়শ্রীর এই সংস্করণটি অনলাইন। 'জয়শ্রী অনলাইন'-এর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়শ্রীর বর্তমান সম্পাদক ও দেশনেত্রী লীলা রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয় কুমার নাগ, প্রাক্তন বিচারক শান্তনু রায়-সহ রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ডাঃ শঙ্কর কুমার চট্টোপাধ্যায়, রজত চক্রবর্তী, সুকান্ত বিশ্বাস, ডাঃ নিতাই চন্দ্র বিশ্বাস, দেবাশিস সেন, অভিজিৎ সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, ভাস্বর দাশ, গৌতম ঘোষ, ড. পলাশ মণ্ডল, অনিমেষ ঘোষ, বাবলু রায়, অনির্বাণ বসু, প্রীতা কুণ্ডু, অভিনব বসু, রৌনক চক্রবর্তী, অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বিজয় কুমার নাগ ও ডাঃ শঙ্কর কুমার চট্টোপাধ্যায়। কবিগুরু রচিত 'ওই মহামানব আসে' গানটি গেয়ে শোনান রজত চক্রবর্তী।

সমবেত কণ্ঠে ''ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'' গানটির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

কলকাতা তপন থিয়েটারে ভরত রস ও ভাব উৎসবে সংস্কার ভারতীর নাট্য প্রযোজনা

গত ৩০ মার্চ, কলকাতা-স্থিত তপন থিয়েটার হলে, ভারত সরকারের আর্থিক সহযোগিতায়, 'নয়াবাদ তিতাস' নাট্য সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো 'ভরত রস ও ভাব উৎসব, ২০২৫'-শীর্ষক নাট্য উৎসবের প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠান। প্রদীপ জ্বালিয়ে এই বর্ণাঢ্য উৎসবের সূচনা করেন ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডিরেক্টর জেনারেল অজয় প্রতাপ সিংহ, অখিল ভারতীয় সংস্কার ভারতীর সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, পদ্মশ্রী পূর্ণদাস বাউল এবং বিশিষ্ট লেখক দিলীপ মজুমদার-সহ বাংলা নাট্য জগতের একগুচ্ছ নবীন-প্রবীণ পরিচালক ও নাট্যকর্মী।

এই উৎসবে 'নয়াবাদ তিতাস' সম্মানিত করে পদ্মশ্রী পূর্ণদাস বাউল ও দিলীপ মজুমদারকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে অজয় প্রতাপ সিংহ বলেন, সংস্কৃতি ও সংস্কার রক্ষার্থে এই ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। নীলাঞ্জনা রায় বলেন, নাটককে অশ্লীল ভাষা এবং কুরুচিকর অঙ্গভঙ্গির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে।

এদিনের নাট্য উৎসবে মোট চারটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করে 'কসবা অর্ঘ্য'। মনীষ মিত্র রচিত ও নির্দেশিত এই নাটকের নাম 'জাস্ট অ্যান আওয়ার'। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। এই নাটকে, এক যুবক, যে আত্মহত্যা করেছে এবং মৃত্যুর পর সে তার উপলব্ধি ব্যক্ত করছে যে, সে কতো বড়ো ভুল করেছে এবং জীবনকে অমর্যাদা করে সে অনুতপ্ত। নাটকটি আজকের প্রজন্মের কাছে একটি প্রয়োজনীয় ও শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দেয়।

উৎসবের দ্বিতীয় নাটক ছিল 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ' দ্বারা প্রযোজিত নাটক 'কেন চেয়ে আছ গো মা'। অমিত দে রচিত ও নির্দেশিত এই নাটকটি ভারতের প্রথম মহিলা রাজবন্দি— বিপ্লবী ননীবালা দেবীর জীবন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর আপোশহীন লড়াইয়ের গল্প মেলে ধরে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যখন ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসা করছেন, সেই সময় সংস্কার ভারতীর এই নাটকটি আরও একবার সবার সামনে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরে সত্যের সন্ধান দেয়। প্রায় ২৫ জন নবীন নাট্যকর্মী অভিনীত এই নাটকটি তার জমাট, অথচ সরল চলন ও বুননের দ্বারা, নৃত্য ও সংগীতের ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শকের মন জয় করে নেয়।

এই উৎসবের তৃতীয় নাটক ছিল 'থিয়েটার শাইন' প্রযোজিত, শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'তোমার ডাকে'। মূলত কোলাজ-ধর্মী এই নাটক পৃথিবীর বিভিন্ন মত-পথের কট্টরপন্থী চরিত্রের সমালোচনা করে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও সম্মান প্রতিষ্ঠার বার্তা দেয়।

এই উৎসবের চতুর্থ ও শেষ প্রযোজনা ছিল 'অনীক' নাট্য সংস্থার নাটক 'হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরা'। নাটকটি রচনা করেছেন নীলাদ্রি মুখোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করেছেন ভাস্কর বণিক। এই প্রজন্মের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠার ছবি মেলে ধরে এই নাটক। কীভাবে, কোন প্রভাবে, বাবা-মায়ের উপর নির্ভরশীল সরল কিশোর, যৌবনে সব বন্ধন মুক্ত হতে চেয়ে ভুল পথ অবলম্বন করে এবং জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে পুড়ে সম্পর্কের আসল গুরুত্ব বা প্রয়োজন আবার নতুন করে উপলব্ধি করে— এই নাটকটি সুন্দরভাবে তা ব্যক্ত করেছে। একদল তরুণ প্রতিভা এই নাটকটিকে খুব যত্ন করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এই উৎসবের গুরুত্ব প্রসঙ্গে 'নয়াবাদ তিতাস'-এর সম্পাদিকা শর্বরী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নাট্য উৎসব হলো মেলবন্ধন ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যম। আমাদের লক্ষ্য থাকবে এই মেলবন্ধন যেন রাজ্য থেকে পুরো দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমরা সচেতনভাবেই এই নাট্য উৎসবে ভরত মুনির নাম উল্লেখ করেছি, যাতে যতবার উৎসবের নামোল্লেখ হবে, ততোবার ভরত মুনিকে এবং তাঁর সৃষ্ট রস ও ভাব নিয়ে কাজ করে তাঁর কাজকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি।'

এই উৎসব সম্পর্কে বলতে গিয়ে সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ কুমার রায় বলেন, 'আমরা এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে, আমাদের পুরনো কিছু অভ্যাস, যা প্রায় বিস্মৃত হতে চলেছে, তা আবার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যেমন বই পড়া ও উপহার হিসেবে বই দেওয়া। তাই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে আমরা দু'খানি বুকস্টল রেখেছি।'

উৎসবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সংস্থার গুরু মনোজ কুমার সাহা (আবির) বলেন, এ রাজ্যের মানুষ ইতিহাসবিস্মৃত এবং চর্চার অভাবে নিজেদের সংস্কৃতিকে ভুলে যাচ্ছে। আমাদের এই নাট্য উৎসবে আমরা সেই সব নাটককে প্রাধান্য দেব— যে নাটক আমাদের শিকড়ের কথা মেলে ধরবে।

এই নাট্য উৎসবে পদ্মশ্রী পূর্ণদাস বাউল ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র দিব্যেন্দু দাস বাউলের সংগীত উপস্থিত দর্শকদের অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তি দান করে। অনুষ্ঠানে গান গেয়ে মাতিয়ে দেন দীপ্তার্ক ধর এবং 'ক্লাউন থিয়েটার' পরিবেশন করে দর্শকের মুখে হাসি ফুটিয়ে অনাবিল আনন্দ দেন পুরুষোত্তম রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্ব খুব প্রশংসনীয়ভাবে পালন করেন প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত। 'নয়াবাদ তিতাস' নাট্য সংস্থার 'ভরত রস ও ভাব উৎসব-২০২৫'-এর প্রথম পর্যায় সার্থকতার সঙ্গে, প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি দর্শকের উপস্থিতিতে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

হিন্দুত্বের মূল্যবোধে অক্ষয় তৃতীয়া উদ্‌যাপন

প্রদীপ মারিক

সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয় শব্দের অর্থ হলো অবিনশ্বর, যার ক্ষয় নেই। অক্ষয় মানে সমৃদ্ধি, প্রত্যাশা, আনন্দ, সাফল্য। বৈদিক বিশ্বাসানুসারে, এই পবিত্র তিথিতে কোনো শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। হিন্দুধর্মে অক্ষয় তৃতীয়ার গুরুত্ব অসীম। হিন্দু পঞ্চাঙ্গের সৌন্দর্য অর্থাৎ হিন্দু ক্যালেন্ডার গ্রহের অবস্থান দ্বারা চালিত হয় তার প্রতিটি হিন্দু পঞ্চাঙ্গ মাসকে পক্ষ বা ১৫ দিনে ভাগ করা হয় যা শুক্লপক্ষ নামে পরিচিত। তা অমাবস্যা বা অমাবস্যার দিন থেকে শুরু হয় এবং কৃষ্ণপক্ষ অর্থাৎ পূর্ণিমা বা পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। অক্ষয় তৃতীয়া বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয় চান্দ্র দিনে পড়ে যা সাধারণ ইংরেজি ক্যালেন্ডারের এপ্রিল-মে মাসে পড়ে। সংস্কৃতে বৈশাখ মানে মন্থন করা লাঠি। এটি সারমর্ম, পদার্থ, সবচেয়ে শুভ বা শুদ্ধতম মন্থন করার মাস।

কেদার-বদ্রী-গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর যে মন্দির ছ' মাস বন্ধ থাকে এই দিনেই তার দ্বার পুনরায় উদ্‌ঘাটন হয়। দ্বার খুললেই দেখা যায় সেই অক্ষয়দীপ যা ছ'মাস আগে জ্বালিয়ে আসা হয়েছিল প্রজ্বলিত রয়েছে।

ভাগবত পুরাণ অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুদামা ছিল তার প্রাণের বন্ধু। গুরুগৃহে থাকার সময় সুদামা একদিন লোভবশত কৃষ্ণের সব খাবার খেয়ে ফেলেছিলেন, কৃষ্ণ খাবার খেতে চাইলে তিনি বলেন সব ছোলা পড়ে গেছে। সুদামা মিথ্যা কথা বলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বলেন, সুদামা তুমি মিথ্যা কথা বললে। পরে সুদামা মস্ত বড়ো পণ্ডিত হন, তিনি টোল খোলেন। শ্রীকৃষ্ণ চলে আসেন দ্বারকায়। সুদামা সব সময় কৃষ্ণনাম করতেন। সুদামার সংসারে নেমে আসে দুর্যোগ। অভাব অনটনে দিন কাটাতে থাকে। খুব অনটনে দিন কাটালেও কখনো শ্রীকৃষ্ণকে দুঃখ মোচনের কোনো কথা বলেননি, অথচ তার মন জ্ঞান ছিল শ্রীকৃষ্ণে। সুদামার স্ত্রী সুশীলা একদিন সুদামাকে বলেন, তুমি এত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করো তা একবার তাঁকে দেখে আসতে পারো না। সুদাম বলেন, কৃষ্ণ এখন দ্বারকার রাজা, আমাকে কি চিনতে পারবেন? —নিশ্চই চিনতে পারবে। তোমাকে কত ভালোবাসে। স্ত্রী সন্তানদের কাতর অনুরোধে বাধ্য হয়ে যখন সুদামা দ্বারকায় পৌঁছান। নিয়ে যান চার মুঠো চিড়ে, যা সুশীলা ভিক্ষে করে এনে একটা কাপড়ে জড়িয়ে সুদামাকে দিয়ে দেন। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণকে সেই চিড়ে দিলে পাছে কিছু মনে করতে পারেন, তাই সুদামা ধুতির কোঁচড়ে লুকিয়ে রাখেন সেই চিড়ে।

বন্ধু সুদামার কাছ থেকে ভগবান জোর করে নিয়ে সেই চিড়ে খান এবং বলেন কলি যুগের সব বৈষ্ণবদের সব থেকে প্রিয় প্রসাদ হবে চিড়ে মাখা ভোগ। সুদামার বিশ্রামের সময় ভগবান দেখলেন তার পায়ের নীচে অজস্র কাঁটা ফুটে আছে, পরম প্রিয় সখা সুদামার পদযুগল স্বয়ং দ্বারকাধীশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চোখের জলে ধুইয়ে দিলেন। ভক্তের পায়ের কাঁটা পরম যত্নে তুলে দিলেন। এ যে ভক্ত আর ভগবানের পরম মিলন। তাঁকে খাওয়ানোর জন্য বন্ধু সুদামার আনা চিড়ে মুগ্ধ করেছিল শ্রীকৃষ্ণকে। এরপর শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে সুদামার সমস্ত দারিদ্র্য ঘুচে যায়। মনে করা হয় যেদিন এই

ঘটনা ঘটেছিল, সেদিন ছিল বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি— অক্ষয় তৃতীয়া।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে অক্ষয়পাত্র দিয়েছিলেন। যখন পাণ্ডবরা বনবাস পর্ব শুরু করেছিলেন, যাতে তাদের সর্বদা প্রচুর পরিমাণে খাবার থাকে। এই অক্ষয় পাত্রের খাবার কখনো ফুরোয় না। এই পাত্র থেকে গরিব মানুষদের খাবার বিতরণ করতেন যুধিষ্ঠির।

প্রথম যুগ হলো সিদ্ধ নৈতিকতার সত্যযুগ এবং দ্বিতীয়টি ত্রেতাযুগ। ত্রেতা যুগের সময়কাল ১২,৯৬,০০০ বছর। এই যুগের পালনকর্তা ভগবান বিষ্ণুর তিন অবতার— বামন, পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই রাজা ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন। এদিনই কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেন। কুবেরের এই দিন লক্ষ্মী লাভ হয়েছিল বলে এই দিন বৈভব-লক্ষ্মীর পূজা হয়। কৌরবদের কাছে পাশা খেলায় হেরে পাণ্ডবরা বারো বছরের জন্য বনবাস এবং এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাসে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের বনবাসে থাকার সময়ে কৌরবদের চক্রান্তে দুর্বাসা মুনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এক রাতে পাণ্ডবদের আশ্রয় গ্রহণ করতে যান। কিন্তু সেই সময় তাঁদের ঘরে কোনো অন্ন ছিল না। ক্ষুধার্ত দুর্বাসা অভিশাপ দেবেন ভেবে ভয় পান পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী। ঠিক সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এসে হাঁড়ির তলায় লেগে থাকা একটমাত্র চালের দানা খেয়ে নেন। আর তাতেই পেট ভরে যায় দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্যদের। দুর্বাসার অভিশাপ থেকে পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে। তাই এই দিনকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।

পুরাণ থেকে জানা যায় অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দের বিনাশের জন্য একটি পরশু অর্থাৎ কুঠার ব্যবহার করেছিলেন বলে তাঁর নাম পরশুরাম হয়েছিল। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই দিন নদীতে স্নান করে সূর্যদান, জপ, হোম এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। বেদব্যাস ও গণেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। এই তিথি হতেই পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রথ নির্মাণ শুরু হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হিন্দুরা সর্বসুখের অধিকারী হতে এবং মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠবাসের সৌভাগ্যলাভ করতে এই ব্রত পালন করেন। অক্ষয় তৃতীয়ায় হিন্দু শাস্ত্রীয় ব্রত পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ অর্থাৎ নতুন কাপড়, কলসী, যব, ভুজ্জি, তালপাতার পাখা ও গামছা সংগ্রহ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথমে যব দিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজা করতে হয়। তারপর ভুজ্জি, জলভরা কলসী, তালপাতার পাখা, গামছা বা নতুন কাপড় ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। এই দিনে যে কোনো অলংকার কেনা খুবই শুভ বলে মনে করা হয়।

দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ স্বরূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যকে বোঝায় এবং বলা হয় যে কেউ যদি এই দিনে সোনা ও রুপা বিনিয়োগ করে তবে দেবী লক্ষ্মী সমৃদ্ধি ও সম্পদের আশীর্বাদ করবেন। এই দিনে শুরু হওয়া যে কোনো ব্যবসার উন্নতি হতে বাধ্য। অক্ষয় তৃতীয়ায় গৃহপ্রবেশ করতে কোনো মুহূর্তের প্রয়োজন নেই। এই দিনে অন্নদান দাতাদের জন্য অনেক শুভমুহূর্ত নিয়ে আসে। গোরুকে খাবার দিলে তার কোনো একটি পাপ ও দোষ দূর হয়। অক্ষয় তৃতীয়ায় উপবাস, সাধনা, দান, জপ পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। দেবী লক্ষ্মী এবং ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা এদিন সকলকে পরম ভগবানের আশীর্বাদ প্রদান করে থাকে। অক্ষয় তৃতীয়াকে মূলত হিন্দু বা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে পালনীয় এক পবিত্র দিন হিসেবে দেখা হলেও জৈন মতেও এই দিনটির বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। জৈন মতে, ২৪ জন তীর্থঙ্কর মানুষকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের দেখানো পথেই মানুষ জন্ম ও মৃত্যুর অতীত 'তীর্থে' পৌঁছতে সক্ষম। এই ২৪ তীর্থঙ্করের প্রথম হলেন ঋষভদেব এবং শেষ ব্যক্তি মহাবীর।

জৈনশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ঋষভদেব ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা। তাঁর রাজত্বে মানুষের কোনো দুঃখ ছিল না। পৃথিবী সেই সময়ে ছিল অগণিত কল্পবৃক্ষে পূর্ণ। এই বৃক্ষের কাছে যা চাওয়া যায়, তাই লাভ করা যায়। কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গে ওই সব কল্পতরুর গুণাবলী হ্রাস পেতে থাকে। মানুষও শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সংকটে পড়তে শুরু করে। সেই অবস্থায় তাঁর প্রজাদের ক্লেশ নিবারণের জন্য ঋষভদেব ছ'টি বৃত্তি অবলম্বনের নির্দেশ দেন। এগুলি অবলম্বন করলে মানুষ জাগতিক ক্লেশ থেকে দূরে থাকবে বলে তিনি বর্ণনা করেন। এগুলি হলো অসি অর্থাৎ রণজীবী, যাঁরা দুর্বলকে রক্ষা করবেন; মসী অর্থাৎ কলমজীবী অর্থাৎ কবি-দার্শনিক-চিন্তাবিদ; কৃষি অর্থাৎ যাঁরা খাদ্য উৎপাদন করবেন; বিদ্যা অর্থাৎ অন্যকে যাঁরা শিক্ষিত করে তুলবেন; বাণিজ্য অর্থাৎ ব্যবসা; এবং শিল্প অর্থাৎ শিল্পকর্ম। ঋষভদেব একবার দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হলেন। সেখানে নৃত্যগীত চলাকালে এক অপ্সরা মারা যায়। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর নৃত্যরতা অপ্সরার আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে বিহ্বল করে তোলে। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ১৩ মাস নির্জলা উপবাসে থেকে সত্যানুসন্ধান করে জন্ম-মৃত্যুর অনিত্যতা এবং আত্মার অবিনশ্বরতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। ১৩ মাস অতিক্রান্ত হলে তিনি তাঁর প্রপৌত্র রাজা শ্রেয়াংশের হাত থেকে অঞ্জলি ভরে ইক্ষুরস পান করে উপবাস ভঙ্গ করেন। সেই দিনটি ছিল অক্ষয় তৃতীয়া। সেই কারণে এই দিনটি জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে থাকেন। এই দিন তাঁরা সন্ন্যাসীদের আহার্য দান করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে, অক্ষয় তৃতীয়াকে মহাকাশীয় বস্তুর সারিবদ্ধতার কারণে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই সময়ে সূর্য ও চন্দ্র উচ্চ অবস্থানে থাকে, ইতিবাচক শক্তি বাড়ায় এবং পুণ্যময় কাজের প্রভাবকে বাড়িয়ে তোলে। অক্ষয় তৃতীয়া মানেই সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উদ্‌যাপন, তার সঙ্গে এই তৃতীয়া আমাদের ধার্মিকতা, দানশীলতা ও কৃতজ্ঞতার চিরন্তন মূল্যবোধের কথা মনে করিয়ে দেয়। □

সংস্কৃত আমাদের নিজের ঘরের সম্পদ

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ভাষা আমাদের চিন্তা, আমাদের ভাবনা, আমাদের অন্তর অথবা বাইরের অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। এমনকী আমাদের অর্জিত জ্ঞান এবং সেই অর্জিত জ্ঞানকে প্রকাশের মাধ্যমও হলো ভাষা। ভাষা আছে বলেই মানুষ অন্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্সটিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিকস ইন্টারন্যাশানাল'-এর ভাষা গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান 'এথনোলগ'-এর মতে বর্তমানে পৃথিবীতে মোটামুটি ভাবে ৭১৬৮টি ভাষা আছে। কিছু ভাষা ধীরে ধীরে কালের প্রভাবে বিলুপ্ত হতে চললেও এর মধ্যে প্রায় ১১টি ভাষা এখনো সর্বাধিক প্রচলিত। যদিও 'এথনোলগ'-এর হিসাব মতো ৩০৪৫টি ভাষা ইতিমধ্যে মৃতভাষার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় ৮০০ কোটি মানুষের মধ্যে বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষাগুলিকে ক্রমানুসারে সাজালে দেখা যাবে—

১. ইংরেজি— প্রায় ১৫০ কোটি মানুষ কথা বলে।
২. ম্যান্ডারিন (চাইনিজ)— প্রায় ১২৯ কোটি মানুষ কথা বলে।
৩. স্প্যানিশ— প্রায় ১১০ কোটি মানুষ কথা বলে।
৪. হিন্দি— প্রায় ৬১ কোটি মানুষ কথা বলে।
৫. ফ্রেঞ্চ— প্রায় ৩০ কোটির বেশি মানুষ কথা বলে।
৬. বাংলা— প্রায় ৩০ কোটি মানুষ কথা বলে।
৭. আরবি— প্রায় ২৮ কোটির বেশি মানুষ কথা বলে।
৮. পর্তুগিজ— প্রায় ২৬ কোটি মানুষ কথা বলে।
৯. রুশ— প্রায় ১৫ থেকে ১৬ কোটি মানুষ কথা বলে।
১০. জাপানি — প্রায় ১২ থেকে ১৩ কোটি মানুষ কথা বলে।
১১. উর্দু— প্রায় ৭ কোটি মানুষ কথা বলে।

এর মধ্যে ইংরেজি, চীনা, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, আরবি ও রুশ— এই ছটি ভাষাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিজেদের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। হিন্দি বা বাংলা সংখ্যার হিসেবে এগুলির থেকে এগিয়ে থাকলেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের দাপ্তরিক ভাষা নয়। তদুপরি উপরিউক্ত ভাষাগুলির কোনোটিও বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষা নয়।

বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষা হলো সংস্কৃত। যার মূল্য আমরা দিতে পারিনি। সেই কারণে জাতিসঙ্ঘের কাছেও আপাতভাবে সংস্কৃত ব্রাত্য। কিন্তু ভেতর ভেতর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই ভাষা নিয়ে গোপন চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে রাশিয়া ও জার্মানি।

আমাদের জাতীয় অবক্ষয়ের শুরু সেদিন থেকেই যেদিন থেকে আমরা সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলে অবহেলা করতে শিখেছি। এক বিশেষ উদ্দেশ্যে বহিরাগত লুঠেরা, বিদেশি উপনিবেশকারীরা এবং তাদের দালালরা আমাদের মনে তিলে তিলে যে এই ভাষা সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা গড়ে দিয়েছে, তা আমরা ভুলে গেছি। সারা বিশ্ব ভয় করে সনাতনী হিন্দুর একতাকে। ভয় করে H I N D U এই পাঁচটা বর্ণের একীকরণকে। তাই, যে ভাষা সারা ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাঁধতে পারে, সেই সংস্কৃত ভাষাকে তারা কৌশলে ভারতবাসীর মন থেকে একরকম সরিয়ে দিয়েছে। বহিরাগত লুঠেরা ধ্বংস করেছে লাখে লাখে পুঁথি। পরে ঔপনিবেশিক আমলে এই ভাষার প্রাচীন পুঁথিগুলির অধিকাংশই বিদেশিরা নিয়ে গেছে নিজেদের দেশে এবং তাদের বিজ্ঞান, সাহিত্য, জীবনচর্যাকে উন্নত করে তুলেছে এই সব পুঁথিগুলির সাহায্যে।

সৈয়দ মুজতবা আলি বলেছিলেন— 'সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।' যে ভাষা বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ ভাষারই মাতৃস্বরূপা, যে ভাষা সনাতন ভারতবর্ষের আত্মা, যে ভাষার কাছে শুধু ভারতীয়রাই নয় প্রকারান্তরে সারা বিশ্বই ঋণী, সেই ভাষাকে জাতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা আমরা আজ পর্যন্ত দিতে পারিনি। আমরা মনে রাখিনি একমাত্র সংস্কৃতভাষাই রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি পেলে ভারতবর্ষের কোনো অঞ্চলের কোনো ভাষার মানুষই তার বিরোধিতা করবে না। ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরকালই সংস্কৃতের ফল্গুধারা বয়ে চলেছে। কারণ, এই একটি ভাষাই ভারতের প্রতিটি ভাষার জননী

স্বরূপ।

ভারতীয় উপমহাদেশ এমনকী তার বাইরেও যে সব ভাষা প্রচলিত, যেমন— চীনা, জাপানি, ইংরেজি, রুশ, পারসিক বা ফার্সি, ল্যাটিন, গ্রিক, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, উর্দু, আরবি ইত্যাদি প্রায় সব ভাষাই বহুভাবে ঋণী সংস্কৃত ভাষার কাছে। যদিও, চীনা অভিধানে আদ্যক্ষর ও শেষ অক্ষরের তালিকা তৃতীয় শতাব্দীতে তৈরি হয় তবুও ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিয়াং বংশের আমলে তা আরও সুষ্ঠুভাবে গঠিত হয় ভারতীয়দের সাহায্যে। ভারতীয়রাই চীনা বর্ণমালার আদর্শ তৈরি করে চৈনিক ৩৬টি ব্যঞ্জনের আদ্যক্ষরই শুধু নয়, মুখের কোন স্থান থেকে ওইসব ধ্বনি নির্গত হবে তাও ঠিক করে দিয়েছিল। এর অর্থ সংস্কৃতভাষা কেবল চীনের সংস্কৃতি ও ধর্মের উপরেই নয়, চীনা বর্ণমালাকেও প্রভাবিত করেছে।

পারস্যের জরাথুস্ত্র প্রবর্তিত উপাসনা বৈদিক ধর্মের দ্বারাই প্রভাবিত। অথর্ববেদের একাংশই হলো জেন্দ অবেস্থা। ম্যাক্স মুলার তাঁর 'Lectures on the Sanskrit Language'— গ্রন্থে লিখেছেন, আমাদের উত্তর ভারত থেকেই জরাথুস্ত্রিয়ানরা পারস্য বা ইরানে কলোনি স্থাপন করে। জেন্দ-অবেস্থাতেই আছে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের একাংশ আফগানিস্থান, বেলুচিস্থানের পথে হিমালয় অতিক্রম করে পারস্যে গেছিলেন। শুধু তাই নয়, বেদ ও জেন্দ-অবেস্থার অনেক শব্দের অর্থ ও তার ধ্বনিগত মিলও একইরকম— যেমন :

বেদ	**জেন্দ-অবেস্থা**	**অর্থ**
অস্মৈ	অহ্মৈ	ইহাদেরকে
কস্মৈ	কহ্মৈ	কোন
শ্বন	স্পন	কুকুর

পারসিকরা 'স'-উচ্চারণের বদলে 'হ' উচ্চারণ করতো তাই তাদের উচ্চারণে 'সিন্ধু' হয়েছে হিন্দু। ওরা 'অসুর'কে-অহুর, 'সপ্ত'-কে 'হপ্ত', 'মাস'-কে 'মাহ', 'সেনা'-কে 'হেনা', 'মিত্র'-কে 'মিথ্র', 'ঘর্ম'কে 'গর্ম' বলতো। সংস্কৃত ও পারসিকের যে বিস্তর মিল আছে তা উপরের উদাহরণগুলিতেই পরিস্ফুট।

উর্দু ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং ক্রিয়াপদগুলির প্রায় ৯৯ শতাংশ এসেছে সংস্কৃত বা প্রাকৃত থেকে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আরব উপদ্বীপের যাযাবর গোষ্ঠীর ভাষা আরবি। যে যাযাবর গোষ্ঠীকে মনে করা হয় প্রাচীন আর্যাবর্তের থেকে বেরিয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠী। সংস্কৃত আরবির থেকে বহু প্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে এর মিলও প্রচুর। আরবি শব্দটি এসেছে অর-ভি থেকে অর্থাৎ যারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন বা চলে গেছে। আল্লাহ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'আ' অর্থে আধার বা ভিত্তি + ইলা অর্থে বিশ্ব। অর্থাৎ বিশ্বের ভিত্তি। 'সমীর' শব্দটির মানে সংস্কৃত ও আরবিতে একই; অর্থাৎ বায়ু। রামাল্লাহ = রাম (রমণীয়) + আল্লাহ। আরবিতে যা সুরা, সংস্কৃতে তাই সূত্র। সুভানাল্লাহ = শুভ + আল্লাহ। 'মোল্লা' = মূল + আল্লাহ (যিনি আল্লার 'মূল' বা 'সার' কি তা জানেন)। হারাম শব্দটি হর + রাম হলেও ঋণাত্মক অর্থ বহন করছে। রমজান শব্দটি রাম + জান (দান)। রাম অর্থে এখানে দানশীল। আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দানের দিন হলো রমজান। 'আয়াতুল্লাহ' শব্দটির অর্থ আল্লার প্রতিনিধি। সংস্কৃতে আয়াত্ন শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। সন্ধি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় আয়ত্ন + আল্লাহ = আয়াতুল্লাহ।

অনেকে বলেন, রাশিয়া শব্দটি ঋষি শব্দের অপভ্রংশ। পৃথিবীর বর্তমান যে ভৌগোলিক মানচিত্র যে রূপ, যে ব্যবধান তা এক সময় ঠিক এই রকমটি ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে আমরা আনতে পারি যে ভারতবর্ষ ছিল ব্রহ্মাবর্তবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত), যা ছিল হিমবর্ষ (হিমালয়-সহ হিমবন্ত প্রদেশ ও নিষধবর্ষের যুগ্মরূপ); চীনের নাম ছিল ইলাবৃত বর্ষ, কোরিয়া ছিল কুরুবর্ষ এবং বর্তমান রাশিয়া ছিল কেতুমাল বর্ষের খানিকটা সহ হিরন্ময়বর্ষ ও রম্যকবর্ষের সমষ্টি। শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী তাঁর 'বৈদিক ভারত' গ্রন্থে শুধু এগুলি সমর্থন করেই থেমে যাননি তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন রুশ ও সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অতি নিকট।

সংস্কৃত	**রুশ**
কদা (কখন)	কগদা
তদা (তখন)	তগদা
বিনা (ছাড়া)	বিনে
দ্বার (দরজা)	দ্বের
চত্বার (চার)	চত্যেরি
ভ্রাত (ভ্রাতা)	ব্রাত
একম (এক)	আদিন
আদি (আদি)	আদিন
দ্বি (দুই)	দ্বি
ত্রি (তিন)	তি
পঞ্চ (পাঁচ)	প্যাচ

'বৈদিক সংস্কৃত' ও 'ল্যাটিন', ভাষা জগতের দুই প্রাচীন সদস্য হলেও সংস্কৃত প্রাচীনতম— একথা আজ প্রমাণিত সত্য। ল্যাটিন থেকেই এসেছে স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, পর্তুগিজ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা। এই ভাষাগুলি যেহেতু ল্যাটিনের অপভ্রংশ তাই এগুলিও সংস্কৃতের কাছে ঋণী। সংস্কৃত পিতা, ল্যাটিনে হয়েছে 'প্যাটার', স্প্যানিশে 'পাদ্রে',গ্রিকে প্যাটার ও ইংরেজিতে 'ফাদার'। মাতা শব্দটি সংস্কৃতে মাতরঃ, ল্যাটিনে 'মাতের', স্প্যানিশে 'মাদ্রে', গ্রিকে 'মাতের', ইংরেজিতে 'মাদার'। আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া যায় কেমনভাবে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে ল্যাটিন ও ইংরেজি শব্দের মিল পাওয়া যায় :

সংস্কৃত	**ল্যাটিন**	**ইংলিশ**
অগ্নি	ইগনিশ	ইগনিশন
দান	দোনাম	ডোনেশন
ধাম	ডোমুস	ডোমিসাইল
নাসা	নাসাম	নোজ
নামা	নোমেন	নেম
বর্বর	বার্বারিয়া	বার্বারিয়ান
জন	জেনিয়া	জিন
দ্বার	দোরু	ডোর
কাল	ক্যালেন্ডা	ক্যালেন্ডার
অষ্ট	অক্টো	এইট
দন্ত	ডেনটিস	ডেনটাল

পরিশেষে জানাই, জ্যোতির্মঠ বা যোশী মঠের পূর্বতন শঙ্করাচার্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলেছেন—

'সংস্কৃত হী ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কা বীজক হ্যায়। বীজক কী রক্ষা আবশ্যক হ্যায়, আপনে ঘর কী নিধি মে লাভ উঠাও।'

মহাপুরুষের এই আহ্বান, এই উপদেশ, আর কবে আমরা রক্ষা করব! আর কবে শোধ করব আমাদের ঋষি ঋণ?

□

খেলার মাধ্যমে ক্রীড়া ভারতী রাষ্ট্র নির্মাণে ব্রতী

পরিচয় : ক্রীড়া ভারতী একটি সর্বভারতীয় অরাজনৈতিক খোলধুলার সংগঠন।

'ক্রীড়া সে নির্মাণ চরিত্র কা, চরিত্র সে নির্মাণ রাষ্ট্র কা'— এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করতে নিয়ে ক্রীড়া ভারতী ১৯৯২ সাল থেকে সারা দেশে কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্রীড়া ভারতীর কাজের সূচনা হয় ২০১২ সালে কলকাতাতে। 'ক্রীড়া বৃত্যা সদাচারো, রাষ্ট্র দেবো কৃতি যুবা' এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের ২৭টি রাজ্য এবং ৫০৪টি জেলা-সহ বহু গ্রামে কাজ করে চলেছে। ভারতীয় বিভিন্ন খেলার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পরম্পরাগত আঞ্চলিক খেলাকেও দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করার চেষ্টা করছে ক্রীড়াভারতী। সমাজের সকল ব্যক্তি খেলার সঙ্গে যুক্ত হোক এবং তাদের স্বাস্থ্য ভালো রাখুক এই উদ্দেশ্যে— হর গাঁও মেঁ ময়দান হো, হর ময়দান মেঁ খেল হো'— এই ব্রতও নিয়েছে সংগঠনটি। শরীর, মন, বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'স্বচ্ছ ভারত, সমর্থ ভারত' এই উদ্দেশ্যও ক্রীড়া ভারতীর। খেলা ও যোগের মাধ্যমে ভারত পৃথিবীতে সুস্থ-সমর্থ দেশ হিসেবে পরিচিতি পাক এই উদ্দেশ্যও ক্রীড়া ভারতীর।

ক্রীড়া ভারতীর লক্ষ্য :

খেলার মাধ্যমে দেশবাসীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো হোক। ভারতীয় খেলা, ব্যায়াম পদ্ধতির প্রচার-প্রসার এবং ভারতীর খেলোয়াড়দের মধ্যে সংস্কার ও দেশভক্তি জাগানো।

ক্রীড়া ভারতীর কাজ :

● ক্রীড়া কেন্দ্র, ● যোগ ও আত্মরক্ষা কেন্দ্র ● সূর্যনমস্কার প্রশিক্ষণ ● দেশি খেলার ক্রীড়াকেন্দ্র স্থাপন।

ক্রীড়া ভারতীর পঞ্চসূত্রী কার্যক্রম :

● ক্রীড়া ভারতী স্থাপনা দিবস (শ্রীহনুমান জয়ন্তী, সদস্য সংগ্রহ অভিযান)।

● রথ সপ্তমী তথা আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২১ জুন। ● রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া দিবস ২৭ আগস্ট (হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ জয়ন্তী)। ● ক্রীড়া জ্ঞান পরীক্ষা। ● জীজামাতা সম্মান।

ক্রীড়া ভারতীর আয়াম :

● মাতৃশক্তি। ● দিব্যাঙ্গ। ● যুবা।

বার্ষিক পঞ্চসূত্রী কার্যক্রম

● ক্রীড়া ভারতী স্থাপনা দিবস (শ্রীহনুমান জয়ন্তী) সদস্য সংগ্রহ অভিযান

শ্রীহনুমান জয়ন্তী চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে ক্রীড়া ভারতীর কাজ আরম্ভ করা হয়। হনুমানজীকে শক্তি, বুদ্ধি ও যুক্তির প্রতিমূর্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। হনুমানজী ব্যক্তিগত জীবনে একজন পারদর্শী ক্রীড়াবিদ ছিলেন। যার জন্য লঙ্কা থেকে সীতা মাতার উদ্ধার হয়েছিল লঙ্কা থেকে। ভারতবর্ষ-সহ পশ্চিমবঙ্গের তিন প্রান্তে বিভিন্ন ক্রীড়া কেন্দ্রে

ফঃ ৫

এই দিনটি বিভিন্ন কার্যক্রম এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে পালন করা হয়। এছাড়া হনুমান চল্লিশা পাঠ, হনুমান জয়ন্তীতে কেন ক্রীড়া ভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবস তার বর্ণনা। কোথাও হনুমান মন্দিরে পূজাপাঠ-সহ প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও থাকে। এই সময় এক মাস ধরে সদস্য সংগ্রহ অভিযানও চলে।

● রথসপ্তমী তথা আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (২১ জুন)

সকলকে সংস্কারের মাধ্যমে ব্যায়াম শেখানো। এই কাজ ভারতবর্ষের ঋষিরা সারা বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছেন। বর্তমান ক্রীড়া ভারতীও একই প্রয়াস নিয়ে কাজ করছে। ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় যুব দিবস (স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী) থেকে রথ সপ্তমী পর্যন্ত সূর্য নমস্কার চলতে থাকে। সূর্য নমস্কার মন্ত্র বলার পর ১৩টি সূর্য নমস্কার ৮ মিনিটের মধ্যে সমাপ্ত করা হয়। পরে সূর্য নমস্কার ফলমন্ত্র দিয়ে শেষ করা হয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস ঘোষিত হয়। ক্রীড়া ভারতী এই দিন ভারতবর্ষের সকল নাগরিককে অনুরোধ করে সার্বজনিক যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য। যোগ আমাদের জন্মগত ভাবে প্রাপ্ত— যার মন্ত্র নিজেকে সুস্থ রাখা। এই চিন্তাভাবনাকে সারা বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একে কার্যকরী করার চিন্তাভাবনা নিয়ে ক্রীড়া ভারতী নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। এজন্য প্রতি বছর ক্রীড়া ভারতী কলকাতার রানি রাসমণি রোডে ২১ জুন রাজ্যপালের উপস্থিতিতে যোগদিবস পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী-সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিতি প্রশংসনীয়। প্রায় ৩ হাজারের উপর সংখ্যা থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন, ক্লাব, ৮টি যোগসংস্থার উপস্থিতিও প্রশংসনীয়। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রীড়া কেন্দ্র এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া ভারতীর প্রচেষ্টায় যোগ দিবস পালন করা হয়ে থাকে। করোনার সময়েও রাজভবনে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়জীর উপস্থিতিতে যোগদিবস প্রতীকী রূপে পালিত হয়েছে। ২১ জুনকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি হচ্ছে এবং স্থায়ী ক্রীড়া কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ছে।

● রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া দিবস ২৯ আগস্ট (হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ জয়ন্তী) :

খেলার জগতে দেশভক্ত আদর্শ খেলোয়াড় ছিলেন ধ্যানচাঁদ। এজন্য খেলোয়াড়ের রাষ্ট্রভক্ত পরিচয় গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ক্রীড়াকেন্দ্রে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়ে থাকে। সঙ্গে খেলোয়াড়ের জীবনী বর্ণনাও করা হয়। ধ্যানচাঁদজীর দেশ মাতৃকার প্রতি অসম্ভব আকর্ষণ ছিল, এজন্য বিদেশি দেওয়া লোভনীয় চাকরিও তিনি করতে রাজি হননি। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষামূলক বিষয়ও রাখা হয়ে থাকে।

● জীজামাতা সম্মান : ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মাতা ছিলেন বীরমাতা জীজামাতা। তিনি বিপরীত পরিস্থিতিতে কীভাবে রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ করতে হয় সেই শিক্ষা পেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে। শিবাজীর মধ্যে বীরভাবনা, সংকল্পশক্তি দিয়েছিলেন মাতা জীজাবাই। জীজামাতার যোগ্য লালন-পালনের ফলেই ছত্রপতি শিবাজী রাষ্ট্র নির্মাণ করার মতো গুণ অর্জন করেছিলেন। তেমনি প্রতিটি খেলোয়াড়ের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের আড়ালে থাকে মায়ের সুকৌশল সহযোগিতা। এজন্য প্রতিবছর রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতায় বিজেতা খেলোয়াড়ের মাকে 'বীরমাতা জীজাবাঈ পুরস্কার' প্রদান করা হয়। সভাপতি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার চেতন চৌহানের কলকাতায় প্রবাস এবং তাঁর প্রাণোজ্জ্বল ভাষণ সবাইকে ক্রীড়া ভারতীর কাজে উদ্দীপ্ত করেছিল। এরপর ক্রীড়া ভারতীর কাজ বিভিন্ন কার্যক্রম ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে প্রসার লাভ করতে থাকলো।

এই সংগঠন ক্রমাগত ১৪ বছর ধরে তাদের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংগঠনের মধ্যে ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক মেলবন্ধন খুব মধুর। ক্রীড়া ভারতীর কাজ পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে ২০১২ সাল থেকে। আজ ক্রীড়া ভারতী এক বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। যার ছত্রছায়ায় কয়েক হাজার ক্রীড়াপ্রেমী-সহ বিভিন্ন খেলায় পারদর্শী ব্যক্তিত্ব নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সংগঠনকে আরও সুদূরপ্রসারী করার জন্য দীর্ঘ ১৪ বছর নতুন নতুন নেতৃত্বে সফলতার নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে, যেখানে আছে সংগঠনিক শৃঙ্খলা, সততা, দেশাত্মবোধের দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ। কয়েক বছরের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সংগঠনটি বর্তমান নির্দিষ্ট দিশা নিয়ে সুচারুভাবে এগিয়ে চলেছে।

এর পেছনে অবশ্য সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাও আন্তরিকতা সর্বাগ্রে প্রশংসনীয়। বিশেষ করে সঙ্ঘ প্রচারক মধুময় নাথ (ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ-সম্পাদক)। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নির্দিষ্ট সময়ে অনুশাসন মেনে কাজ করার পদ্ধতি, যা আমরা প্রতি পদে পদে অনুভব করি। অভিভাবক রূপে আছেন— তপনমোহন চক্রবর্তী। তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরিচিতি আমাদের সাংগঠনিক কাজকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সুদূরপ্রসারী করেছে। সর্বদা পাশে থেকে সাংগঠনিক কাজকে বিস্তারের কৌশল প্রণেতা হিসেবে আছেন বিভাস মজুমদার (প্রাক্তন সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ)। এছাড়া সঙ্ঘ প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত ভ্রমণ ও সময় দানের আহ্বান সবাইকে প্রেরণা দিয়েছে। পর্বতারোহী তেনজিং নোরগে পুরস্কার প্রাপ্ত দেবাশিস বিশ্বাসের সহজ সরল জীবনযাত্রা আমাদের কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দেয়। খুব সুন্দরভাবে তিনি বলেন— 'কাজের ক্ষেত্রে পিছনের পাকে শুধু নিয়ম মেনে সামনে এগিয়ে নিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় থামতে শিখতে হবে। তাহলেই আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো।' তিনি বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সভাপতির দায়িত্বে আছেন। এছাড়া যাদের কথা বলা হলো না, তাদের সকলের যোগদান ক্রীড়া ভারতীর কাজকে চলমান করে রেখেছেন আন্তরিক ভাবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মতো আমাদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তে এই ব্যবস্থা করা হয় প্রতি বছর। পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাসের মাকেও একটি অনুষ্ঠানে ক্রীড়া ভারতী বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছে।

● ক্রীড়াজ্ঞান পরীক্ষা : ছাত্র-ছাত্রী তথা

অভিভাবক- অভিভাবিকাদের খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য ক্রীড়াজ্ঞান পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ফর্ম পূরণ ঘরে বসে অন লাইনে করা যায়। পরিবারের সকলে মিলে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন। এজন্য সকলের খেলার প্রতি রুচি বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে খেলার জ্ঞানও বৃদ্ধি পায় এবং ক্রীড়া ভারতী সম্পর্কে সকলে ঘরে বসে জানতে পারে। এই পরীক্ষা সাধারণত বছরের শেষের দিকে করা হয়।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখ পরীক্ষা হয়েছে। এই পরীক্ষায় প্রথম পুরস্কার এক লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার দু'জন পায় পঞ্চাশ হাজার টাকা, তৃতীয় পুরস্কার চার জন পঁচিশ হাজার টাকা। এছাড়া প্রতি ক্ষেত্র থেকে ১ জন করে ১১ জন ১১ এগারো হাজার টাকা করে পুরস্কার পেয়ে থাকে। এবছর আমাদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত থেকে পূর্বক্ষেত্রে প্রথম হয়েছে সায়ন মাইতি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর নীম পীঠ স্কুলের ছাত্র। সে এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তাঁকে ক্রীড়া ভারতীর পক্ষ থেকে ১১ হাজার টাকার চেক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী খেলামুখী হোক এবং আরও পুরস্কার প্রাপ্ত হোক, ক্রীড়া ভারতী এই কামনা রাখে।

১১ সেপ্টেম্বর : প্রতি বছর ১১ সেপ্টেম্বর ভারত জাগো দৌড়ের আয়োজন করা হয়। কারণ ১১ সেপ্টেম্বর স্বামীজী বিশ্বের দরবারে সনাতন ধর্মকে বিশ্ব মাঝে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এজন্য যুব সমাজকে খেলার প্রতি আগ্রহ ও দেশকে আগে বাড়ানোর জন্য ক্রীড়া ভারতীর এই প্রয়াস। এবছর বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের স্মরণে ভারত জাগো দৌড়, ম্যারাথন দৌড় করানোর পরিকল্পনা নিয়েছে ক্রীড়া ভারতী।

পশ্চিমবঙ্গে ক্রীড়া ভারতীর কার্য বিস্তারে কার্যকর্তাদের ভূমিকা :

ক্রীড়া ভারতীর এই কাজ পূর্ব ভারতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে শুরুর প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ লক্ষ্মণরাও পার্ডিকর-সহ মধুময় নাথের সহযোগিতায় কলকাতার সল্টলেকে তপনমোহন চক্রবর্তীর বাড়িতে। তিনি বাণীপুরের ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। এরপর কল্যাণ ভবনে কতিপয় প্রান্ত কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গে বিশ্বশ্রী মনোহর আইচের অংশগ্রহণ ও বক্তব্য ক্রীড়া ভারতীর চলার পথকে আরও সুদৃঢ় করে।

উল্লেখ্য, এ বছর খেল মহাকুম্ভে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত থেকে ৬২ জন খেলোয়াড় কবাডি এবং খো খো খেলায় অংশ নিয়েছিলেন। ৫-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খেল মহাকুম্ভ প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যবিস্তার :

প্রথম কাজ শুরু হলো আন্তঃবিদ্যালয় কবাডি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। কলকাতায় অনেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচয় বাড়ল, তাকে কেন্দ্র করে শ্যামবাজার আহিরি টোলায় কাবাডি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। যেখানে অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত বর্তমান প্রদেশ সভাপতি বিশ্বজিৎ পালিতের সহযোগিতা অনেকখানি ফলপ্রসূ হয়েছে। এই সঙ্গে অনেক কাবাডি সংস্থার সঙ্গে ও ক্রীড়া ভারতীর সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

পরে ফুটবল প্লেয়ার সুপ্রকাশ গড়গড়ি, সুমন দে-র সহযোগিতায় আন্তঃবিদ্যালয়— 'বিবেকানন্দ ফুটবল কাপ আয়োজন হলো। সেন্ট লরেন্স বিদ্যালয়ে এই খেলায় ফাইনাল খেলা হলো— ইস্ট বেঙ্গল মাঠে, যার সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন ভারতীয় মহিলা ফুটবলার ইন্দ্রাণী সরকারের ব্যবস্থাপনায়। সার্বিক ভাবে কল্যাণ চৌবের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে ২১ জুন প্রথম আন্তর্জাতিক যোগদিবস পালন করা হলো যোগাচার্য ফণিভূষণ মঞ্চের হলে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। সেখানে বিভিন্ন সংস্থায় যোগের প্রদর্শন এবং তাদের সম্মানিত করা হয়। এর সঙ্গে সূর্য নমস্কারের প্রতিও ক্রীড়া ভারতী সমদৃষ্টি দিয়ে ক্রীড়াকেন্দ্র বাড়ানোর প্রসঙ্গ শুরু করে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সারাদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন বিচার পরিবার মিলে সূর্য নমস্কার মহাযজ্ঞ আয়োজিত হয়। ক্রীড়া ভারতীর সক্রিয় অংশগ্রহণে ১১৪ কোটি মানুষ সূর্য নমস্কারে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে বাইক র‍্যালির মাধ্যমে সারা দেশকে যুক্ত করার এক অভিনব অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় সারাদেশে। সেখানে শামিল হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। এই অনুষ্ঠানে এ রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের কার্যকর্তাদের দৃঢ়তা এই কার্যক্রমে সফলতা এনে দেয়। উৎসাহের সঙ্গে যুবক-যুবতীরা বাইক র‍্যালির মাধ্যমে সারা পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে একই দিনে একই সময়ে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে দেশ রক্ষায় সংকল্প নেয়। জেলা সম্মেলন, প্রান্ত সম্মেলন ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা প্রদর্শনমূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় বছরে একবার ভ্রমণ, পরিবার মিলন হয় যেমন— সুন্দরবন, গঙ্গাসাগর, মুকুটমণিপুর, মায়াপুর ইত্যাদি জায়গায় হয়েছে। সারা ভারতবর্ষ-সহ পশ্চিমবঙ্গেও কয়েক হাজার খেলোয়াড়ের সার্ভে ফর্ম ফিলাপ হয়েছে তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়ে।

এই সমস্ত কাজ সাবলীল ভাবে করা সম্ভব হয়েছে ক্রীড়া ভারতীর সকল কার্যকর্তাদের নিরলস সহযোগিতার জন্য। এছাড়া সদস্য এবং ক্রীড়াপ্রেমী ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক সহযোগিতা ও সম্পর্কের জন্য, ক্রীড়া ভারতী আগামী দিনে আরও সুন্দর ভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার আশা রাখে। এছাড়া বার্ষিক যোজনায় বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে ঘরে ঘরে কাবাডি খেলা এবং প্রতি পরিবারে আপাতত একজন করে আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

শিল্পীমনে রাষ্ট্রীয়তার বোধ জাগরণে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ

সুভাষ ভট্টাচার্য্য

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য, আদর্শ তথা ভাবধারাকে পাথেয় করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শিল্পীদের পরম্পরাগতভাবে সংস্কৃতিমনস্ক করার ব্রত নিয়ে ১৯৮১ সালে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়। সংস্কার ভারতীদ্দ প্রথম সভাপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, সাধারণ সম্পাদক ড. বিষ্ণু শ্রীধর বকনকর এবং সংগঠন সম্পাদক যোগেন্দ্রজী। সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠা হবার পর পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে সংস্কার ভারতীর নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলেছে ১৯৮৫ সাল থেকে। এই সময় অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন পণ্ডিত হিমাংশু বিশ্বাস এবং সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

সর্বভারতীয় এই সংগঠনের শাখা পশ্চিমবঙ্গে বিধিসম্মতভাবে শুরু হোক এই চিন্তা নিয়ে ১৯৮৭ সালের ১৬ জুন বর্ধমান শহরে এক বৈঠকে সঙ্ঘের প্রবীণতম প্রচারক কেশবজীর পৌরোহিত্যে এবং অরুণ চক্রবর্তী, ভোলানাথ চন্দ, শিবেশ সান্যাল, নিবারণ চট্টোপাধ্যায় এবং অশোক কর্মকার ও সুভাষ ভট্টাচার্য্যের উপস্থিতিতে সংস্কার ভারতীর কাজ যাতে এখানে সুশৃঙ্খলভাবে শুরু হয়, সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরপর ১৯৮৭ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ'র। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর তৎকালীন সংগঠন সম্পাদক যোগেন্দ্রজী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং স্টেটসম্যান পত্রিকার তৎকালীন প্রধান বার্তাসম্পাদক বিশ্বজিৎ মোতিলাল। ১৯৮৭ সালে এই প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৯ সালে হায়দরাবাদে আয়োজিত প্রথম সর্বভারতীয় 'কলা সাধক সঙ্গমে' পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাতজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন তৎকালীন প্রাদেশিক সভাপতি সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে।

কেশবরাও দীক্ষিত

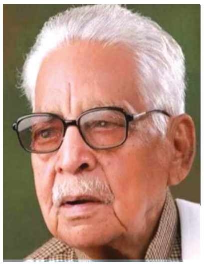

যোগেন্দ্রজী

১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শিল্পী সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল উত্তর কলকাতার হটকেশ্বর ভবনে এবং প্রকাশ্য অনুষ্ঠান হয় বিদ্যামন্দির সভাগৃহে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী ড. সুনন্দা পট্টনায়ক, প্রাদেশিক সভাপতি ড. যামিনী গাঙ্গুলী, বিশিষ্ট অভিনেতা উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন সভাপতি ড. শৈলেন্দর নাথ শ্রীবাস্তব এবং সংগঠন সম্পাদক প্রয়াত যোগেন্দ্রজী ও অভিনেতা তপন গাঙ্গুলী যিনি আজও একই ভাবে আমাদের মধ্যে রয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এই ৩৮ বছরের যাত্রাপথে যাঁদের আশীর্বাদ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কেশবরাও দীক্ষিত ড. যামিনী গাঙ্গুলী, ড. গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র দে, পণ্ডিত এ. কানন, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, গোরা সর্বাধিকারী, ভবেন্দু ভট্টাচার্য্য এবং অমল শংকর। এছাড়া আরও যাঁদের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতা পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি তাঁরা হলেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও পরিচালক পদ্মভূষণ ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মমতা শঙ্কর, তনুশ্রী শঙ্কর, অলকানন্দা রায়, অলকা কানুনগো, অমিতা দত্ত (নৃত্যসাধিকা), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. বিজয় আঢ্য (সাহিত্যিক ও সাংবাদিক), রঞ্জিত মল্লিক, সুদীপ মুখার্জী, কৌশিক চক্রবর্তী, অরিন্দম গাঙ্গুলী (অভিনেতা), ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ (বাচিক শিল্পী), শিক্ষাবিদ ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

সংস্কার ভারতীর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে অভিনব কার্যক্রম বা প্রয়োগ হলো সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর প্রকাশ, যা বিগত কুড়ি বছর ধরে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গর পক্ষ থেকে আমরা করে আসছি।

১৯৮৭ সাল থেকে এভাবেই সংস্কার ভারতীর যাত্রা শুরু হয়, যা আজ এই ২০২৫ সালেও অব্যাহত হয়ে চলেছে এবং আগামীতেও যথার্থ হাতে এর আরও উত্তরণ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ সংগঠন আমাদের সবার, তাই হাতে হাত রেখে একে আলোর পথে আরও অগ্রসর করে দেওয়ার ব্রতও আমাদের সবার। বর্তমানে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তে, ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন সুভাষ ভট্টাচার্য্য, নীলাঞ্জনা রায়, গোপাল কুণ্ডু, নিখিল সমাদ্দার, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ভরত কুণ্ডু, মহাশ্বেতা চক্রবর্তী, তিলক সেনগুপ্ত, অমিত দে, রীণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। □

কিকবক্সিং বিশ্বকাপে জোড়া স্বর্ণপদক জয়ী বঙ্গতনয়া আরাধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মাত্র ৯ বছর বয়সে কিকবক্সিং বিশ্বকাপের আসরে জোড়া স্বর্ণপদক জয় করে রেকর্ড করল ছোট্ট আরাধ্যা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের মেয়ে আরাধ্যা ধীবর দুর্গাপুরের পূর্ব ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। ছোটোবেলা থেকে তার স্বপ্ন দেশের হয়ে কিছু করার। স্কুলজীবনে প্রবেশের পর কিকবক্সিঙে হাতেখড়ি। আরাধ্যার কিকবক্সিং প্রশিক্ষক হলেন ঈশ্বর মাঝি। তাঁর কাছে দেড়বছর ধরে তালিম নেয় আরাধ্যা। অরেঞ্জ বেল্ট প্রাপক হওয়ার পাশাপাশি ইতিমধ্যেই স্কুলস্তর, জেলা-রাজ্য-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মোট ২০টি পদক পেয়েছে সে। এবার সেই ঝুলিতে যুক্ত হলো আরও দুটি পদক।

গত ৭ এপ্রিল থেকে ১২ এপ্রিল থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরের ব্যাংকক ইউথ সেন্টার (থাই জাপান) ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় কিকবক্সিং বিশ্বকাপ। মোট ৪০টি দেশের প্রায় ৯০০ জন ক্রীড়াবিদ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। আয়োজক দেশ থাইল্যান্ড ছাড়াও মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, তুরস্ক, ডেনমার্ক, ইজরায়েল, প্যালেস্তাইন, আমেরিকা, কানাডা, পর্তুগাল, মরিশাস, মরক্কো, ইউক্রেন, উজবেকিস্তান, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, এস্তোনিয়া, ইরাক, ইরান, ভারত, চীন, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড়রা এই বিশ্বকাপে যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কিকবক্সিং বিশ্বকাপের শুভ সূচনা করেন বিশ্ব কিকবক্সিং পরিচালন সংস্থা— দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ কিকবক্সিং অর্গানাইজেশনস্ বা ওয়াকো-র প্রেসিডেন্ট রয় বেকর। প্রতিযোগিতা শুরুর পর তাতামি ফাইট, রিং ফাইট ও গালা ফাইটের প্রতিযোগীরা পরপর বিভিন্ন ইভেন্ট ও এজ ক্যাটিগরিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। ৭ তারিখ নয়াদিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কিকবক্সিং টিম ইন্ডিয়া বা ভারতীয় কিকবক্সিং দলের মোট ২২ জন খেলোয়াড়, ৩ জন কোচ (প্রশিক্ষক), টিম ম্যানেজার-সহ মোট ৩১ জনের প্রতিনিধি দলটি ব্যাংককে রওনা হয়। এই বিশ্বকাপে মোট ৩২টি ক্যাটিগরিতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করে। -৩৬ ও +৩৬ বিভাগে পয়েন্ট ফাইট ইভেন্টে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে আরাধ্যা। দুটি ইভেন্টেই সাফল্য লাভ করে সে।

তবে এই বিশ্বকাপে সাফল্যের পথ মোটেই সহজ ছিল না আরাধ্যার কাছে। তার পরিবারের ছিল না আর্থিক সঙ্গতি। বিশ্বকাপের রেজিস্ট্রেশন ফিজ, যাওয়া- আসার খরচ, আন্তর্জাতিক মানের খেলার সরঞ্জাম সংগ্রহ, অভিভাবকের সমস্ত খরচ ইত্যাদি বাবদ প্রয়োজন ছিল প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। আর্থিক সমস্যার কারণে একটা সময় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন আরাধ্যার বাবা-মা। রাজ্যের শাসক দলের অনেক নেতা, মন্ত্রী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নানা আশ্বাস দিয়েও কোনোরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ফলে ঋণগ্রহণে বাধ্য হন আরাধ্যার অভিভাবকরা। বেশিরভাগ অর্থ ঋণের মাধ্যমে জোগাড় হলেও মেয়ের জন্য রাখা ভবিষ্যৎ সঞ্চয় থেকেও ব্যয় করেছেন আরাধ্যার বাবা-মা। প্রশিক্ষক ঈশ্বর মাঝির আন্তরিক প্রচেষ্টায় কিছু সমাজসেবী এগিয়ে এসে আরাধ্যাকে সহযোগিতা করেন। ঈশ্বরবাবু বলেন, 'আমাকে অনেকে আরাধ্যার ব্যাপারে প্রশ্ন করে, ওর খবর নেয় এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে। আংশিক হলেও তাঁদের এই বিশেষ অবদানের জন্য আরাধ্যা আজ বিশ্ব দরবারে ভারতের হয়ে খেলতে পেরেছে। পদক জয়ের জন্য আমরা গর্বিত কারণ আরাধ্যা আমার অ্যাকাডেমির ছাত্রী।'

আরাধ্যার পাশে ছিল স্কুলও। পূর্ব ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, নির্দেশক ও প্রিন্সিপাল সুব্রত চট্টোপাধ্যায় জানান, 'আমরা খুবই গর্বিত আরাধ্যার বিশ্বজয়ের ব্যাপারে। আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে কিছু সহযোগিতা করা হয়েছে আরাধ্যাকে। আগামীদিনেও ওর পাশে আমরা দাঁড়াবো।'

আরাধ্যার মা কাকলী ধীবর জানিয়েছেন, 'বিদেশের মাটিতে বিশ্বকাপে দেশের হয়ে স্বর্ণপদক জয় করা গর্বের বিষয়। ওকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা ছিল। সেই আশা আজ পূর্ণ হলো। তবে ওর সামনে অনেক ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। আগামীদিনে উজবেকিস্তান, হাঙ্গেরি, ইতালি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের হয়ে খেলার দরজা খুলে গিয়েছে। কিন্তু কোনো সংস্থা বা সরকার যদি আর্থিক খরচ বহন না করে, তবে আর কোথাও হয়তো পাঠাতে পারব না। আগামীদিনে কোনো সংস্থা ওর কেরিয়ারের দায়িত্ব নিলে খুব ভালো হয়।'

কম বয়সেই ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছে বিশ্বকাপে স্বর্ণপদক জয়ী আরাধ্যা। তার লড়াই আগামীদিনে কিশোর-কিশোরীদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠতে পারে। আরাধ্যার সামনেও এখন অনেক পথ চলা বাকি। সব বাধা জয় করে একদিন সে একজন বড়ো মাপের ক্রীড়াবিদ নিশ্চয়ই হয়ে উঠতে পারবে। □

বলুর দুষ্টুমি

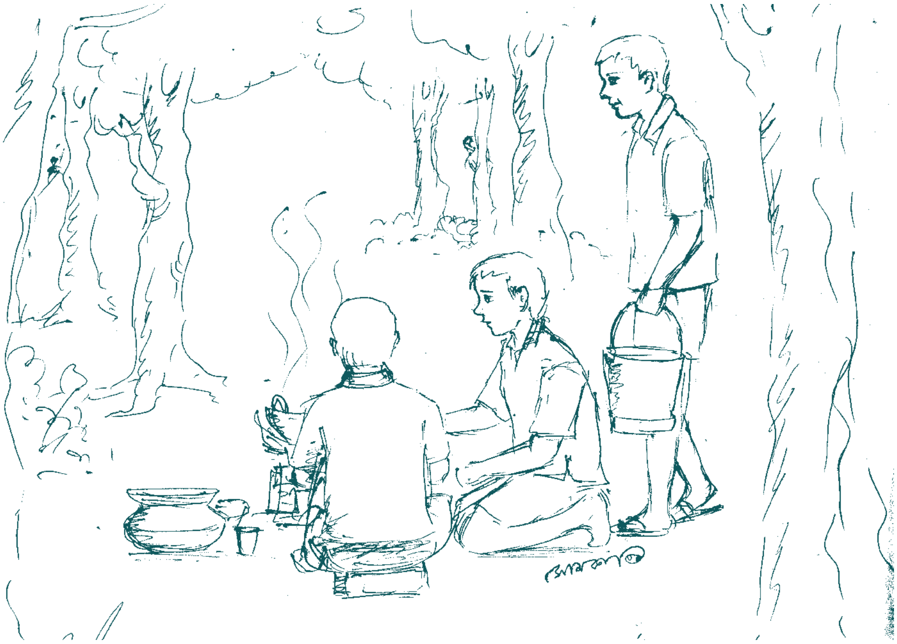

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন গড়াইপুর গ্রামে অনেক লোক বাস করত। বেশিরভাগ লোক ছিল চাষি। সারা বছর তারা ধান, গম, সর্ষে, আলু এবং নানান শাকসবজি চাষ করত।

ওই গ্রামে একজন চাষি ছিল। তার নাম ছিল গলু। তার বয়স পঞ্চাশের বেশি হলে খুব কর্মঠ। সেও তার জমিতে অনেক কিছু চাষ করে। তার দুই ছেলে— পেলা আর কলা। দুই ভাই বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করে। আলুচাষ করার কারণে তারা গ্রামে সম্পন্ন চাষি হিসেবে পরিচিত।

গ্রামে পেলা ও কলার বলু ও বলাই নামে দুই বন্ধু ছিল। একদিন পেলা আর কলা ঠিক করল তারা গ্রামের পাশের জঙ্গলে বনভোজন করবে। তারা ঠিক করল বনভোজনে বলাইকে নেবে। বলুকে নেবে না। কারণ বলু খুব দুষ্টু। আগেরবার বনভোজনে বলুকে যে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সে তা তো করেইনি উপরন্তু দুষ্টুমি করে বনভোজন পণ্ড করে দিয়েছিল। তাই এবার তিনজনেই বনভোজন করবে ঠিক করল। তারপর তিনজনে ঠিক করল কে কী দায়িত্ব পালন করবে। ঠিক হলো— সরু চালের ভাত রাঁধবে কলা। মটনকষা বানাবে বলাই আর পায়েস রাঁধবে পেলা।

সেই মতো নির্দিষ্ট দিনে তারা তিনজনে গোরুর গাড়িতে করে বনভোজনের উপকরণ নিয়ে জঙ্গলে রওনা হলো। জঙ্গলে পৌঁছে তারা বড়ো একটা গাছ দেখে তার ডালে একটা মাচা তৈরি করল। কারণ খাওয়াদাওয়ার পর একটা জোর ঘুম দিতে হবে। বনভোজনের সাজসরঞ্জাম গাছের নীচে রেখে প্রথমে তারা গেল শুকনো ডালপালা জোগাড় করতে। বেশ কিছুটা শুকনো ডালপালা এনে তারা গাছের উপর উঠে মাচা বেঁধে নেমে এল।

বলু একটু দূরে আড়ালে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছিল আর ভাবছিল এবারও ওদের বনভোজন মাটি করতে হবে।

তারপর তারা তিনজনে রান্না করতে শুরু করল। বলু এই ফাঁকে গাছে উঠে মাচার দড়ি আলগা করে দিয়ে নীচে নেমে আবার লুকিয়ে পড়ল। ওদের রান্না শেষ হতে দেড়ঘণ্টা সময় লাগল।

রান্না শেষ করে ওরা আধঘণ্টা জিরিয়ে নেওয়ার আশায় গাছের উপর উঠে মাচায় চাপতে গেল। যেই তারা মাচায় নেমেছে তখনই তিনজনেই হুড়মুড় করে মাচা সমেত 'পপাত ধরণী তল'। পেলার পা লেগে ভাতের হাঁড়ি গেল উলটে। কলা পড়ল মটনের ডেকচিতে। কলা খুব লোভী। ওখানেই মটন খেতে শুরু করল। বলাই পায়েসের ডেকচির উপর পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

এদিকে পেলা 'ওরে মা রে, বাবা রে' বলে চিৎকার করে লাফাতে লাফাতে সারা গা চুলকাতে শুরু করল। আসলে, এক ফাঁকে বলু ওখানে বিছুটির পাতা ছড়িয়ে রেখেছিল। তারপরে স্নান করে গা টা মুছে শুধু পায়েস দিয়েই ওদের বনভোজন সারতে হলো।

ওদিকে বলু 'কেমন জব্দ' বলে বাড়ির দিকে দৌড় দিল। এরপর মনে হয় না ওরা আর কোনো দিন বনভোজন করবে।

রূপসা রায়, নবম শ্রেণী, লেকটাউন, কলকাতা-৪৮।

জাতীয় উদ্যান

নাগরহোল

নাগরহোল জাতীয় উদ্যান কর্ণাটক রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের মহীশূর ও কডাগু জেলার সীমাতে পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। এই বনাঞ্চলটি সম্পূর্ণ সমতল। এর আয়তন প্রায় ৬৪৩ বর্গকিলোমিটার। বনাঞ্চল যেখানে শুরু হয়েছে, তার থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে উদ্যানের প্রবেশদ্বার। এই দূরত্বেও বন্যজন্তুর দেখা পাওয়া যায় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। উদ্যানটি ১৯৮৩ সালে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা পায়। মূল প্রবেশদ্বার থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ইরপু নামের একটি জলপ্রপাত। উদ্যানের ভেতরে লক্ষ্মণাবতী নামে একটি নদী রয়েছে। পশুপ্রাণীদের মধ্যে রয়েছে বাঘ, হরিণ, হাতি, সোনালি বাঁদর, ভালুক, কেটেলা, পহু ইত্যাদি। পাখির মধ্যে ময়ূর, বগলা, পেঁচা এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। বৃক্ষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গোলাপকাঠ, চন্দন, সেগুন ও রুপালি ওক।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৬৫

সপ্তমী বিভক্তি: – ক্লীবলিঙ্গে

মন্দিরম – মন্দিরে। মন্দির– মন্দিরে।

নগরম্ – নগরে,

জলম্–জলে।

গৃহম্– গৃহে।

পুষ্পম্–পুষ্পে।

কথা পুস্তকে অস্তি – গল্প বইতে আছে।

অভ্যাসং কুর্ম:

মকর: জলে অস্তি। দেবী মন্দিরে অস্তি। কজ্জলং নেত্রে অস্তি। সুগন্ধ ভোজনে অস্তি। অধিকারী মহানগরে অস্তি। নবনীতং দুগ্ধে অস্তি।

প্রয়োগং কুর্ম: –

নগরম্, ভবনম্, ফলম্, চিত্রম্, আসনম্, দ্বারম্, বাতায়নম্, ফলকম্, রাজ্যম্, বিমানম্, ললাটম্, বনম্, পাত্রম্ দূরদর্শনম্।

ভালো কথা

শ্রীরামনবমীর আনন্দ

এবারও সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের পাশে হনুমান মন্দির থেকে শ্রীরামনবমীর বিশাল শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। আমাদের বীরেশ্বর শাখার সবাই এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলাম। বড়ো একটা লরিতে আলোকসজ্জা ছিল, তাতে ডিজে বাজছিল। আরেকটা লরিতে রামধুন গান চলছিল। রাস্তায় নাচের দল গানের তালে তালে নাচতে নাচতে চলছিল। ঢাকির দল ঢাক বাজাচ্ছিল। আমরাও ঢাকের তালে তালে নাচতে শুরু করলাম। আমাদের মধ্যে সবচাইতে ছোটো ছিল বিভু। ওর থেকে একটু বড়ো দিব্য। ওরাও সারা রাস্তা নেচেছে। আমাদের দেবুদার উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি। অঙ্কিত, বিষ্ণুরও কম ছিল না। প্রায় শেষের দিকে দীপমাল্য যোগ দিয়েছিল। রাস্তায় মাঝে মাঝে রামভক্তরা আমাদের জল মিষ্টি দিচ্ছিল। দু'ঘণ্টা পরিক্রমা করে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে রামমন্দিরের সামনে শোভাযাত্রা শেষ হলো। সেখানে প্রসাদ নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। এবারও খুব আনন্দ হলো।

নীল সুর, দশমশ্রেণী, ৭/বি, বালক দত্ত লেন, কলকাতা-৭।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

কালবোশেখি

বিদিশা সেন, দ্বাদশ শ্রেণী, ঝালদা নামোপাড়া, পুরুলিয়া

সন্ধ্যেবেলা ঝমঝমিয়ে
বৃষ্টি এল মুষলধারে
সেই বৃষ্টিতে সবাই মিলে
ভিজতে ছিলাম মনটি ভরে।
শরীর মন শীতল হলো
দাবদাহ সব গেল দূরে
আবহাওয়াটা এমনিতরো
থাক না কেন বছর ভরে!

সকালবেলা পরদিনেতে
সূর্যিমামা উঠল তেজে
সারাদিনটা প্রখর তাপে
ধরিত্রীটা গেল ভেজে।
বাবা বললেন গ্রীষ্মকালে
কালবোশেখি এমনি করে
হঠাৎ হঠাৎ চলে আসে
ধরিত্রীকে শান্ত করে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

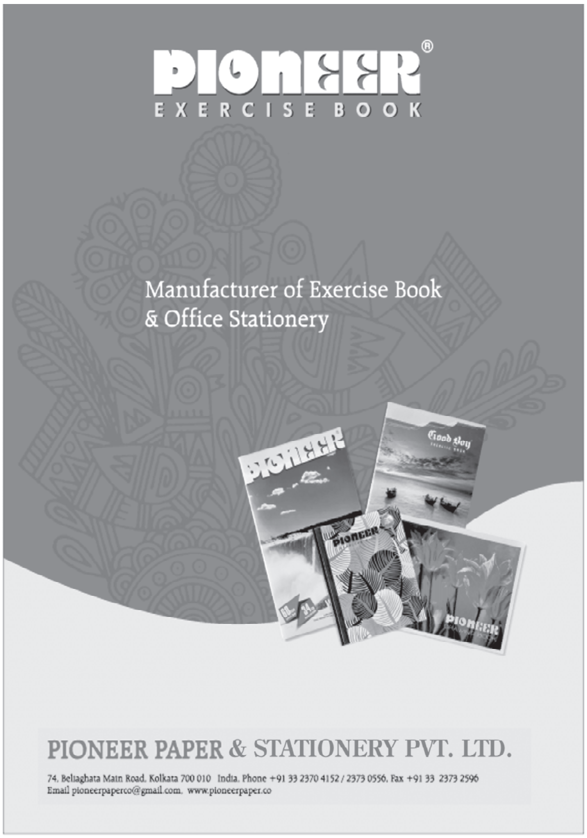

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

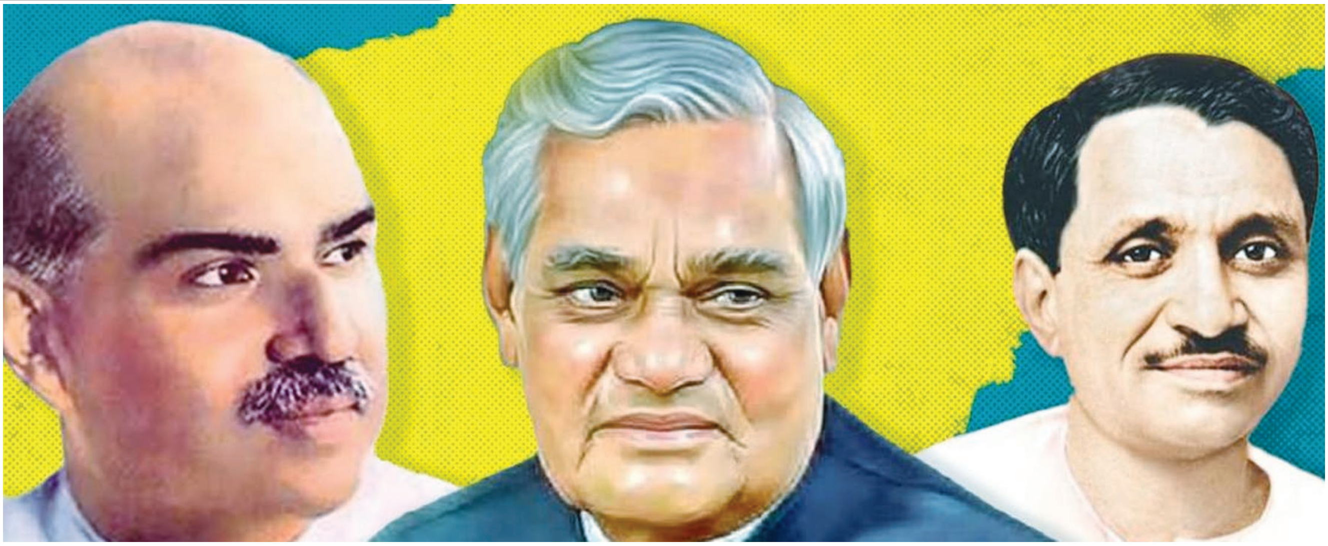

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রারম্ভিক ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

পর্ব-১

প্রণয় রায়

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) উল্লেখযোগ্য সাফল্য রাজ্য রাজনীতিতে এক মোড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়— যেন গেরুয়া জোয়ার এবং লাল পতনের যুগ। এই উত্থানের পিছনে থাকা কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট—হিন্দু মহাসভা, ভারতীয় জনসঙ্ঘ এবং সঙ্ঘ বিচার পরিবারের মতাদর্শ ও সাংগঠনিক প্রভাব বুঝতে হবে।

উনিশ শতকে বঙ্গপ্রদেশে হিন্দু জাতীয়তার বীজ রোপিত হয়, যা পরে মহারাষ্ট্রে বিকশিত হয়ে ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পথে নিয়ে যায়। সঙ্ঘের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার কলকাতায় পড়াশোনা করার সময় বাঙ্গালি বিপ্লবীদের কাছ থেকে জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণা পান।

হিন্দু মহাসভা সেই সময় বঙ্গপ্রদেশে সক্রিয় ছিল এবং মুসলিম লিগের বিরোধিতা করে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯৪৭ সালের দেশভাগ— এই দুটি ঘটনাই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতিকে ত্বরান্বিত করে। বিশেষ করে ১৯৪৬ সালের 'কলকাতায় হিন্দু নরসংহার' এবং পরবর্তীকালে নোয়াখালিতে হিন্দু গণহত্যা হিন্দু সমাজকে গভীরভাবে আঘাত করে।

১৯৪৬ সালে কলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশনের সময় বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দির তীব্র সমালোচনা করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। স্বাধীনতার পরে ইংরেজদের শর্ত অনুযায়ী সকল দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় সরকার তৈরি হয়। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে সেই জাতীয় সরকারে ড. মুখার্জি শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হন। তিনি ১৯৪৮ সালে হিন্দু মহাসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে মন্ত্রীসভা থেকেও পদত্যাগ করেন।

১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর সঙ্ঘকার্যকর্তা ও প্রচারকদের কয়েকজন দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (এম এস গোলওয়ালকর)-র সঙ্গে আলোচনায় বসে বলেন রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গিন, দেশ ভাগ করে মুসলমানরা পাকিস্তান পেয়ে ওপারে চলে গেছে। এখানে জাতীয় কংগ্রেসের তোষণনীতি দেশ বা জাতিকে সঠিক পথনির্দেশ করতে অসমর্থ এবং হিন্দু মহাসভা ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে। ড. মুখার্জি হিন্দু মহাসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। সামনে রাজনৈতিক পথ নির্দেশের জন্য এমন কোনো সেরকম সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এখন ভারতীয়ত্বের আদর্শে ও সাংস্কৃতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ একটা রাজনৈতিক দলের আশু প্রয়োজন। আমরা অনুভব করছি, সঙ্ঘ যদি এই ঐতিহাসিক

ফঃ ৬

ক্ষণে এদিকে একটু বিশেষ চিন্তা করে একটা রাজনৈতিক দল শুরু করে, তাহলে দেশের মঙ্গল হবে বলে আমাদের মনে হচ্ছে। কার্যকর্তা ও কয়েকজন প্রচারকের ভাবনার কথা শুনে শ্রীগুরুজী কদিন ভাববার সময় নেন। পরে তিনি তাঁদের ডেকে জানান, আমরা কোনোদিন রাজনীতি করিনি, রাজনীতির কাজকর্ম জানা নেই, দল কে চালাবে? যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে পাওয়া যায় যিনি রাজনৈতিক দল চালিয়েছেন বা রাজনীতি করেছেন, যাঁর কিছু অন্তত অভিজ্ঞতা আছে এরকম কোনো ব্যক্তি পাওয়া যায় কিনা দেখুন। সে সময় একনাথ রানাডে যিনি কন্যাকুমারী শিলাখণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের স্মারক মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, কলকাতায় পূর্বাঞ্চল প্রচারক হিসেবে আসেন। তৎকালীন বর্ধমান জেলা প্রচারক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পূর্ব পরিচয় ছিল। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে একনাথজী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে কথা বলেন। শ্রীগুরুজীর সঙ্গে দিন স্থির করে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যান। শ্রীগুরুজী ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কথাবার্তা হয়। তারপর ২১ অক্টোবর ১৯৫১ 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়।

সভাপতি হিসেবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম স্থির হয়। আলোচনা অনুযায়ী শ্রীগুরুজী রাজনৈতিক কাজে প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রতিটি প্রদেশ থেকে দুজন করে প্রচারককে জনসঙ্ঘের সহায়তার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৫২ সালে ভারতের সর্বপ্রথম নির্বাচনে 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' দেশের স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিগণিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে দু'জন প্রচারককে জনসঙ্ঘের জন্য দেওয়া হয়— রামপ্রসাদ দাস ও প্রভাকর ফৈজপুরকর।

নিজস্ব কর্মদক্ষতা ও প্রতিভার কারণেই দীনদয়াল উপাধ্যায় ১৯৫২ সালে কানপুরে 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ'-এর সর্বপ্রথম অধিবেশনে জনসঙ্ঘের সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত হন। সর্বভারতীয় সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই অধিবেশনে প্রথম ভাষণেই বলেন, 'আমাকে দু'জন দীনদয়াল দিন, আমি ভারতের স্বরূপই বদলে দেব। তাঁর মতো কার্যকর্তার জন্য আমি গর্বিত।' দীনদয়ালজী এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহুদিন থেকে কঠোর পরিশ্রম করে জনসঙ্ঘকে

হরিপদ ভারতী

দেশব্যাপী বিস্তার করেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম রাজ্য সম্মেলন হয় মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায়। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১৯৫২ সালে সংসদের প্রথম নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন জনসঙ্ঘের দুইজন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ও দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে দক্ষিণ কলকাতা ও মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হন। বিধানসভায় খড়্গপুরের ডাঃ শতপতি ও জনার্দন সাধুসহ একজন বিধায়ক নির্বাচিত হন। সকলেই মেদিনীপুর জেলার।

এদিকে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর ভারতের অবিভক্ত অঙ্গ মেনে নিয়েও আলাদা প্রধান, আলাদা বিধান, আলাদা নিশান রাখার দাবি নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী কার্যকলাপ শুরু করে। শেখ আবদুল্লার এই চিন্তা ও কাজের বিরুদ্ধে ড. শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে সংসদ উত্তাল হয়ে ওঠে। তিনি এর প্রতিবাদে কাশ্মীরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

দেশের অনেক চিন্তাশীল, বিদ্বজ্জন, বুদ্ধিজীবী এবং শ্রীগুরুজী-সহ বহু সহৃদয় ব্যক্তি ডঃ শ্যামাপ্রসাদের কাশ্মীর যাওয়াকে কোনো ভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। অনেকে এর মধ্যে একটি গভীর ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করেছিলেন। অনেক মনে মনে খারাপ কিছু ঘটার অনুমান করেছিলেন। কারণ ভারতবর্ষের মঙ্গলের কথা তুলে ধরার জন্য লোকসভায় নেহরুর সামনে ড. মুখার্জি ছাড়া অন্য তেমন কানো প্রতিপক্ষ ছিল না। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫৩ সালে ১০ মে জম্মু-কাশ্মীরের উদ্দেশে রওনা দেন।

কাশ্মীরের পুলিশ ডঃ মুখার্জি ও সহযাত্রী মৌলীচাঁদ শর্মা, গুরুদত্ত বৈদ্য, টেকচাঁদ শর্মা, বলরাজ মধোক-সহ আরও কয়েকজন সঙ্গীকে ১১ মে গ্রেপ্তার করে। সর্বসময়ের সঙ্গী তরুণ অটলবিহারী বাজপেয়ীকে তিনি দিল্লিতে ফিরে যেতে বলে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, অটল, তুমি সমস্ত দেশবাসীকে জানিয়ে দাও 'শ্যামাপ্রসাদ' ভারতের সমস্ত প্রদেশের মতো জম্মু-কাশ্মীরেও কোনো পারমিট ছাড়াই স্বাধীন ভাবে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ওই জেলেই মাত্র ৫২ বছর বয়সে ২৩ জুন তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু হলো। মা যোগমায়াদেবী মৃত্যুসংবাদ শুনে চিৎকার করে কেঁদে বলেন 'আমি গর্ব করে বলছি যে আমার ছেলের অকালমৃত্যুতে ভারতমাতার অনেক ক্ষতি হলো।'

অশ্রুজলে শপথ নিয়ে জনসঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংগঠন একত্রিত হয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের হত্যার তদন্তের দাবি তুলল, তা শীঘ্রই আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী জনমানুষের অন্তরের দাবি হয়ে ফুটতে থাকে। তা সত্ত্বেও জনসঙ্ঘের চলার গতি ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। ডঃ মুখার্জির পর প্রেমনাথ ডোগরা, ডঃ রঘুবীর, বলরাজ মাধোক, দক্ষিণের ভি. রামা রাও, বৎসরাজ ব্যাস-সহ কয়েকজন জনসঙ্ঘের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ-সহ সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে সবচেয়ে বেশিদিন সভাপতিত্ব করেন। সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্বের একান্ত অনুরোধে দীনদয়ালজী ভারতীয় জনসঙ্ঘের কালিকট অধিবেশনে সর্বভারতীয় সভাপতির

দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সম্মত হন।

কিন্তু ১৯৬৮ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি মুঘলসরাই রেল ইয়ার্ডে তাঁকে রহস্যজনকভাবে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর পর পার্টির নেতৃত্বে অটলজী সকলের মন আকর্ষণ করেন এবং মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন।

৭০-এর দশকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের জন্য এবং নেতাদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে দেশের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন ভাবে আন্দোলন শুরু হতে থাকে। গুজরাটে ভ্রষ্ট কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে জাতীয়তাবাদী যুব ও ছাত্র নেতারা একত্রিত হয়ে আন্দোলনের জন্য অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্বে মিলিতভাবে জয়প্রকাশ নারায়ণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তাঁকে গুজরাটে আসার অনুরোধ করে। জয়প্রকাশজী ছাত্র নেতাদের আমন্ত্রণ স্বীকার করে গুজরাটে এসে ছাত্রদের যথাযথ উপদেশ ও পথনির্দেশ দেন। 'নবনির্মাণ সমিতি'র নামে অহিংস আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন।

১৯৭৪ সালে গুজরাট, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি'র নামে আন্দোলনটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন জয়প্রকাশজী।

১৯৭৪ সালে ৪ নভেম্বর দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় বিহার পুলিশ প্রচণ্ড লাঠি চালায় এবং একটা লাঠি জয়প্রকাশজীর মাথার উপর পড়ার মুহূর্তে জনসঙ্ঘের নেতা নানাজী দেশমুখ পাশে থেকে নিজের ওই আঘাত নিজের মাথায় নেন, ফলে জয়প্রকাশজী রক্ষা পান।

১২ জুন ১৯৭৫ সাল, এলাহাবাদ উচ্চ আদালত ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করে। ২৫ জুন ১৯৭৫ জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিশাল জনসভা হয়। যেখানে সমস্ত দলের প্রায় সব নেতা উপস্থিত ছিলেন। পরদিনই ২৫ জুন ১৯৭৫ শ্রীমতী গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ইন্দিরা গান্ধী কেবল জয়প্রকাশজীকেই, নয় দেশের সমস্ত বিরোধী নেতাকেও গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেন। 'নবনির্মাণ সমিতি' কলকাতায় 'জনসংঘর্ষ সমিতি'র নাম নিয়ে আন্দোলন শুরু করে দেয়। এদিকে জনগণ এখনও কংগ্রেসের

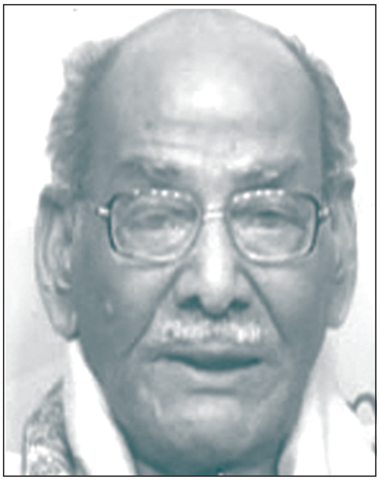

সুকুমার ব্যানার্জি

সঙ্গেই আছে, এই বিশ্বাসে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৭ সালে ১৮ জানুয়ারি লোকসভার নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে বিক্ষিপ্ত ও বিভাজিত প্রতিপক্ষ তাঁর ক্ষমতার মোকাবিলা করতে পারবে না। লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণার পর বিরোধী নেতাদের কারামুক্ত করা হতে থাকে। জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচন লড়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। ভারতীয় লোকদল, জনসঙ্ঘ, সমাজবাদী পার্টি, পরে বাবু জগজীবন রাম এবং হেমবতীনন্দন বহুগুণার দলও একত্রিত হয়ে লোকসভায় লড়ার জন্য প্রস্তুত হন। ভোটে ইন্দিরা সরকারের পতন হয়। ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন সরকার গঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ২৭ মার্চ। তার আগেই সমস্ত দল মিলিত হয়ে 'জনতা পার্টি' গঠন করে। চন্দ্রশেখরজী সভাপতি হন। সব দল মিলে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা পার্টির সরকারের হাতে ভারতের দায়িত্ব তুলে দেয়।

জনতা পার্টি ও সরকারের মধ্যে দ্বৈত সদস্য পদের অভিযোগে দলের মধ্যে ভাঙনের আভাস দেখা যায়। জনসঙ্ঘের নেতারা বলেন, আমরা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক আছি ও থাকবো। জনতা সরকার ভেঙে যায়। অবশেষে ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল সকলের চিন্তার ফলস্বরূপ ভারতীয় জনতা পার্টি নামে সর্বসম্মতিক্রমে একটি নতুন দলের আবির্ভাব ঘটে। ওই সভায় ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি হন অটলবিহারী বাজপেয়ী। লালকৃষ্ণ আদবাণী, সিকন্দর বখত ও সুরজ ভানকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই দিন সভায় উপস্থিত সমস্ত সদস্য ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যরূপে পরিগণিত হন। অটলজী প্রদেশ ভ্রমণে কলকাতায় আসেন। মহাজাতি সদনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম সভাপতির প্রথম সভা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। সভায় অটলজী অধ্যাপক হরিপদ ভারতীকে পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি রূপে ঘোষণা করেন। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি মাত্র দুটি আসন পেলেও ১১ শতাংশ ভোট পায়। সেই ভারতীয় জনতা পার্টি আজ দেশের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। □

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ বীরভূম জেলার নানুর খণ্ডের কীর্ণাহার শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুপ্রকাশ ঘোষ গত ৬ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ২ কন্যা, ১ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

স্বস্তিকার লেখক ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী অতসী ঘোষ রায় (বেবী) গত ২৭ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ১ কন্যা ও আত্মীস্বজনদের রেখে গেছেন।

ত্রিপুরার শ্রমিক কর্মচারীদের নতুন দিশা দেখাচ্ছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় সরকারি, বেসরকারি ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের কার্যকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনার কারণে ফিরতে চলেছে সুসংহত কর্মসংস্কৃতি ও শৃঙ্খলা। অতীতের সকল সংকীর্ণতার বেড়াজাল হতে বেরিয়ে এসে প্রাণচঞ্চল হতে চলেছে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের কাজ। কংগ্রেস ও সিপিআইএম-এর ফেলে যাওয়া আদর্শহীন কর্মসংস্কৃতি চিরতরে বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে 'ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস)'। নতুন নেতৃত্বের দক্ষতা, উৎকর্ষতা, দেশাত্মবোধ এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এই সফলতার মূল নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করছে এখানে। সর্বত্র ফিরে আসতে চলেছে সাবলীল কর্মসংস্কৃতি। সাম্প্রতিক সময়ে এই বিশাল পরিবর্তনের পেছনে যে কর্মযজ্ঞ কাজ করেছে তার জন্য ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি প্রশংসার দাবিদার। দীর্ঘদিনের অনেক চড়াই উৎরাই ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগঠন এগিয়ে চলেছে সুচারুরূপে। এক্ষেত্রে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায় হতে নতুন নেতৃত্ব তুলে এনে গঠিত হয়েছে একটি আদর্শ সংগঠন।

আসলে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নে ত্রিপুরা বিএমএস বড়ো অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এখন সক্ষম। ১৯৫৫ সালের ২৩ জুলাইয়ে রোপিত বীজ বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। আজ শুধু সারা ভারতেই নয় সেটা এখন বিশ্ব শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা ধর্ম-দর্শন, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের আবিশ্ব স্বীকৃতি আজকে ভারতবাসীকে সম্মানিত করেছে। শ্রমিকদের মধ্যে মতবাদের ভিন্নতা এতদিন আমাদের শুধু পিছিয়েই রাখেনি এগিয়ে যাওয়ার অনেক সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ এরূপ একটি সমস্যা হতে বের হয়ে এখন অনেক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। যে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী সংগঠিত ও অসংগঠিত পর্যায়ে থেকে ভারত নির্মাণে এতদিন কাজ করে যাচ্ছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি কার্যকর্তা- কর্মচারীদের রাজনীতি করার অধিকার প্রদানের মাধ্যমে বিএমএস-এর সফলতা একটি নতুন মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হলো। ভারতীয় অর্থনীতিতে বিএমএস-এর অবদান এখন সূর্য উঠার মতো সত্য। শক্তিশালী হচ্ছে দেশ, বার্তা যাচ্ছে বিদেশেও।

১৯৫৫ সালে দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, আদর্শিক স্বপ্ন ও নির্দেশনায় গঠিত ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ আজকে ভারত নির্মাণের এক কারিগর। একজন চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী, যিনি আত্মত্যাগের মহৎ নীতি গ্রহণ করে তাঁর সমগ্র জীবনকে সামাজিক কাজের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। সংগঠনের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার জন্য তিনি যে কয়জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মী সংগ্রহ করে দিয়ে গেছিলেন তাদের শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী হয়ে আজকের দিনে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রতিটি কার্যকর্তা এবং সদস্য ভারত নির্মাণে নিরলস, অগ্রণী সৈনিকের মতো ভূমিকা রেখে চলেছেন। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটিও আজকে তার ব্যতিক্রম নয়। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত এলাকা হতে নতুন নতুন আত্মত্যাগী কর্মী তুলে এনে ত্রিপুরার মজদুর সঙ্ঘকে রূপান্তরিত করা হয়েছে এক শক্তিশালী ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি হিসেবে। এই দুরূহ কাজটি সম্পাদনে প্রদেশ কমিটির সভাপতির নিরলস চেষ্টা ও সততা একটি অনুকরণীয় উদাহরণ। বর্তমানে ত্রিপুরার সকল সেক্টরে গড়ে উঠেছে সেক্টর ভিত্তিক ইউনিয়ন। গত ৩০ নভেম্বর ও ০১ ডিসেম্বর দু'দিন ব্যাপী ১৫তম রাজ্য কার্যকরী প্রদেশ সমিতির একটি সভা ধলাই জেলার পিআরটিআই হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সহ-সংগঠন মন্ত্রী এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রভারী গণেশ মিশ্র। তিনি প্রত্যক্ষ করে গেছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির অভূতপূর্ব সফলতা। মিশ্রজীর দক্ষ নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় চলে আসা মজদুর সঙ্ঘ ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি আজকে একটি শক্তিশালী রূপ ধারণ করেছে। □

দুর্গত মানুষের সেবায় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি

জীবনময় বসু

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯৫১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীগুরুজীর নির্দেশে। সেই সময়ে কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার রণদেব চৌধুরী সভাপতি এবং অমল কুমার বসু— সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোট ১৫ জনের এক কর্মসমিতি গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন ক্ষেত্র প্রচারক একনাথজী রাণাডে বাস্তুহারার কাজকে কেন্দ্রীভূত ভাবে পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় আসেন ও কাজ শুরু করেন। যদিও দেশ ভাগের দুঃখ, ক্লেশ ও যন্ত্রণা লাঘব করার লক্ষ্য নিয়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকাজ শুরু হয় ১৯৫০-এর শুরু থেকেই ধারাবাহিক ভাবে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত প্রায় ৪৫ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে ত্রাণ বিলি, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার কাজ স্বয়ংসেবকরা সুচারু রূপে সম্পন্ন করেন। ১৮ মাসের সেবাকাজের বিবরণ ও আয়-ব্যয়ের হিসেব অডিটরের স্বাক্ষর-সহ কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর বৈঠকে পেশ করা হয়।

একনাথ রানাডে

১৯৪৯ সালের শেষার্ধে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু বিতাড়ন কাণ্ডে লক্ষাধিক হিন্দু সর্বস্বান্ত হন। কোনোরকমে যারা ভারতে পৌঁছন তাঁদেরই উদ্বাস্তু আখ্যা দেওয়া হয়। অসহায় উদ্বাস্তু হিন্দুদের সেবার নিমিত্ত অনেক সহায়তা সমিতি গঠিত হয়। স্বদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়নের কারণে ভারতবাসীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ক্রোধ বাড়তে থাকে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সমস্ত জনগণ ভারত সরকারের পাশে দাঁড়ায়। পরিণামস্বরূপ নেহরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পাকিস্তানের হিন্দুদের ফেলে আসা জমি-সম্পত্তি ব্যবহারের সুযোগ এবং ভারতে পরিত্যক্ত জমিতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনে উভয় সরকার সহমত হয়। যদিও বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তান 'নেহরু-লিয়াকত' চুক্তির শর্তকে মান্যতা দেয়নি। তার কুফল আজও আমরা বহন করে চলেছি। এর শেষ কোথায় এবং তার ফলাফল কী হবে তা বলা কঠিন।

অমল কুমার বসু

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ বাস্তবে সরকার দ্বারাই সম্ভব, কোনো বেসরকারি উদ্যোগে সম্ভব নয়, কারণ তাদের ক্ষমতা সীমিত। বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি উদ্বাস্তুদের কাজ, চাকুরি, ব্যবসার জন্য টাইপ রাইটিং, শর্টহ্যান্ড, অ্যাকাউন্টেন্সি ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থা ও সাহায্য করে, বিভিন্ন কারখানায় কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে, প্রশিক্ষণের সময়ে কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে। প্রায় ৬ হাজারের বেশি পরিবার এতে উপকৃত হয়। কালের অমোঘ নিয়মে উদ্বাস্তুরা ভারতে সামাজিক ব্যবস্থায় শামিল হয়ে যান এবং বাস্তুহারা সহায়তা সমিতিও তার সেবা কাজের ধারা বদল করে সামাজিক, অর্থনৈতিক শিক্ষা, সামাজিক উৎপীড়নে স্থানচ্যুতদের পুর্নবাসন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাহায্য ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করে।এছাড়াও সমিতি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য আর্থিক সাহায্য, বই কেনার জন্য এককালীন সাহায্য, চক্ষু/স্বাস্থ্য শিবির করা এবং বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করার কাজে ব্যাপৃত আছে। এসব কাজে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থার আর্থিক সহায়তা সমিতির কাজকে আরও সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করছে। ▫

সঙ্ঘ শতবর্ষে পঞ্চপরিবর্তনের একটি পরিবার প্রবোধন

সারদা প্রসাদ পাল

একজন স্বয়ংসেবক পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজীকে প্রশ্ন করেছিলেন সঙ্ঘের ও স্বয়ংসেবকদের লক্ষ্য পরমবৈভশালী রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন কবে পূর্ণ হবে?

উত্তরে তিনি বলেন অতি শীঘ্রই আমাদের দেশ ভারতবর্ষ পরম বৈভবসম্পন্ন হবে। সেই অবস্থায় পৌঁছতে গেলে হিন্দু সমাজকে তার ধারক হতে হবে। তাই সমাজকে প্রস্তুত করতে হবে। সেই সমাজ তখনই প্রস্তুত হবে যখন সমাজের প্রতিটি পরিবার বর্ধিষ্ণু ও যোগ্যতাসম্পন্ন হবে। এই বিষয়কে মাথায় রেখে শতবর্ষে সঙ্ঘের কার্যকর্তারা পঞ্চ পরিবর্তনের মধ্যে পরিবার প্রবোধনকে রেখেছেন।

বিশ্বের অন্যান্য দর্শন এই বিশ্বকে বাজার হিসেবে দেখলেও হিন্দু দর্শন বিশ্বকে পরিবার হিসেবে মনে করে। আমাদের সমাজের যা কিছু গুণসম্পন্ন বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে অন্যতম উত্তম ব্যবস্থা পরিবার পরম্পরা। এই পরিবার ব্যবস্থা কবে থেকে শুরু তার হিসেব করা যাবে না। তবে মহাউপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায় ৭১ থেকে ৭৩ শ্লোকে বলা হয়েছে :

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।

উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।

পরিবারের আর একটি উদাহরণ শোনা যায়, যম-যমুনার শ্লোকে। সেখানে যম তাঁর বোন যমুনাকে বলছে, এই চরাচরে কোনো নারী পুরুষকে পুরুষ হিসেবে দেখার পরিবর্তে পিতা, পুত্র বা ভ্রাতার দৃষ্টিতে দেখলে অথবা পুরুষ কোনো নারীকে নারী হিসেবে না দেখে নিজের মা বা ভগ্নী হিসেবে দেখলে তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণতা লাভ করবে। এই উপলব্ধি থেকেই পরিবারের সঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যুগে এখনও এই পরিবার ব্যবস্থা এত ভালো আছে যে ব্রিটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার মীরাটের একটি পরিবার কয়েকদিন কাটিয়ে গেলেন। তিনি এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে দেশে ফিরে বলেছিলেন, ব্রিটেনের

সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থাকে এখানে চালু করতে হবে।

ভারতে হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব। হিন্দু পরিবার বলশালী হলে সমাজ তথা রাষ্ট্র বলশালী হবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটা বন্ধন গড়ে উঠে। বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং ছোটোদের প্রতি ভালোবাসার যে টান অনুভূত হয় তাতেই বন্ধন আরও দৃঢ় হয়ে উঠে। কবির কথায় বললে এরকম : আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।।

শ্রদ্ধা কেমন হয় তার একটি উদাহরণ : তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা। বড়লাট কার্জন বাঙ্গলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জিকে ইংল্যান্ডে গিয়ে সরকারের কিছু কাজ করে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য একটা ডিগ্রিও নিয়ে আসার অনুরোধ করেছিলেন। স্যার আশুতোষের যাতায়াতের ভার বহন করবে সরকার। আশুতোষবাবু বললেন ঠিক আছে আগে মায়ের অনুমতি পাই তারপর বলব। শুনে কার্জন সাহেব রেগে গিয়ে বলেছিলেন, আপনি কী মনে করেন? আমি ব্রিটিশ-ভারত সরকারের প্রধান, আপনার মা কি আমার থেকেও বড়ো?

উত্তরে আশুতোষবাবু বললেন যে আমার মা আমার কাছে সবার থেকে বড়ো। এমনকী ঈশ্বরের থেকেও। আর ভালোবাসার উদাহরণ— একবার গান্ধীজী টেগোর হিলে গেছিলেন। তিনি টিলার উপর থেকে দেখলেন একটি বাচ্চা মেয়ে একটি শিশুকে নিয়ে টিলার উপরে চড়ছে। শিশুটির চেহারা মেয়েটির থেকে অনেক ভারী। উপরে উঠতে মেয়েটির বেশ কষ্ট হচ্ছে। উপরে ওঠার পর মেয়েটিকে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন, কি কষ্ট হলো তো? মেয়েটি একগাল হেসে বলল, কষ্ট হবে কেন? এতো আমার নিজের ভাই। যেহেতু নিজের ভাই তাই কষ্ট হয় না। নিজের ভাই হলো আদরের।

সমাজ পরিবর্তনের আগে নিজের পরিবারে এই ভাব আনতে হবে। বর্তমানে পরিবারের সদস্যরা বিশ্বের নানা প্রান্তে থাকে। তাদের সঙ্গে সবসময় কথা হয় না, দেখাসাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকল সদস্য প্রত্যেকে ভালোবাসার টানে বাধা থাকে। সেই ব্যবস্থা করতে হবে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার সময় মাতৃভাষায় কথা বলা, বছরে একবার একজায়গায় জড়ো হওয়া, কুলদেবী দর্শন করতে যাওয়া। এই কারণে অষ্টাঙ্গ মার্গের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে— যেমন, ভূত, ভবিষ্যৎ, ভাষা ভূষা, ভজন-ভোজন, ভবন-ভ্রমণ।

নিজের পরিবারকে সামাজিক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে তোলার জন্য সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। মুক্তসমাজ তৈরি করতে হলে নিজের পরিবারকে সর্বপ্রথম সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে। যাদের সাহায্যে প্রতিদিন আমাদের দিনানিপাত হয় অর্থাৎ সেই সাফাই কর্মী, যারা চুল কাটে, যারা কাপড় কেচে দেয়, জুতা সেলাই করে দেয়, আমাদের পোশাক ইস্ত্রি করে দেয়, তাদের নিজের বাড়িতে ডেকে পরিবারের সবার সঙ্গে সহভোজ করা প্রয়োজন।

সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় বালাসাহেবজী বলতেন অস্পৃশ্যতা যদি পাপ না হয় তবে পৃথিবীতে আর কোনো পাপ নেই। তিনি এটা শুধু কথার কথা বলেননি। নিজের পরিবারে এটি প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে অস্পৃশ্যতা মুক্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে গর্ব অনুভব করতেন।

পাশ্চাত্য দর্শন বলে সমাজ Maximum Good of Maximum People-এর কথা। কিন্তু আমরা Maximum-এ বিশ্বাসী নয়। বিশ্বাসী সর্বে। তাই বলি সর্বে সন্তু নিরাময়ের কথা। এই ব্যবস্থা আমাদের সমাজে চালু ছিল। তাই যারা ভিক্ষা করতে বাড়িতে আসে তাদের বলি ভিক্ষা নয়, আদায়ে এসেছে। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যের হাত দিয়ে তার কাছে সাহায্য পাঠাই যাতে সমাজের জন্য কিছু করার ভাব ছোট্ট সদস্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। শতবর্ষে সঙ্ঘ চায় স্বয়ংসেবক এবং তার পরিবারের মাধ্যমে এই সংস্কারের বিস্তৃতি হোক। তবেই পরিবার যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হবে। আমাদের দেশ পরমবৈভবশালী হবে।

'মা'কে কেন্দ্র করে আমাদের পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যতই হিন্দু বিরোধীরা বলুক যে হিন্দু সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের কোনো সম্মান ছিল না তাঁদের কোনো বিশেষ ভূমিকা ছিল না, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে তাঁরাই সংসার প্রতিপালনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মা কেমন ছিলেন? একটা উদাহরণ দিই। সবাই এখন একটা শব্দের সঙ্গে খুব পরিচিত, সেটা AI অর্থাৎ Artificial Intelligence। পরিবারে মা হলেন N.I. Natural Intelligence অর্থাৎ শুধু সন্তানেরা নয় পরিবারের কার কী অসুবিধা সেটা খাবার হোক বা অন্য কিছু, সমস্ত বিষয়ে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। তারা কিছু বলার আগেই সমস্যার সমাধান করে দেন তাঁরা। সেই জন্য আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা বন্ধন তৈরি হয় 'মা'কে কেন্দ্র করে।

পারিবারিক স্তরে চেতনা জাগরণের আবশ্যক সিঁড়ি হলো পরিবার প্রবোধন। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হলো পরিবার ব্যবস্থা। সমাজের ক্ষুদ্রতম স্বরূপ পরিবারে অনুভব করা যায়। বলা হয় সংস্কার প্রদানের প্রথম পাঠশালা হলো পরিবার।

১. সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন একসঙ্গে ভোজন করা।

২. মাসে অন্তত ১/২ বার পরিবার-সহ নিকটবর্তী মন্দিরে যাওয়া।

৩. মাসে একবার পারিবারিক বৈঠকের আয়োজন করা।

৪. পরিবারের পরম্পরা জানা।

৫. অন্তত পাঁচ পূর্বপুরুষের পরিচয় জানা।

৬. ভোজনের সময়ে ইলেক্ট্রনিক্স উপকরণ ব্যবহার না করা।

৭. সপ্তাহে অন্তত একদিন বাড়িতে পূজাঘরে একসঙ্গে উপস্থিত হওয়া।

৮. সপ্তাহে অন্তত একদিন শিশুদের সঙ্গে মহাপুরুষ জীবনী আলোচনা করা।

৯. পরিবারের সকলে একসঙ্গে গীতাপাঠ করা বা ভজন করা বা সুভাষিত (শ্লোক) বলা।

১০. ইলেক্ট্রনিক্স উপকরণ, দূরদর্শন, দূরভাষ, কম্পিউটারের ব্যবহার না করে সপ্তাহে ১/২ ঘণ্টা একসঙ্গে বসে গল্প করা।

১১. নিজের বংশের ব্যক্তির দ্বারা কৃত ভালো কাজের আলোচনা করা। □

চাকরিহারাদের হাতে রইল পেনসিল

অজয় ভট্টাচার্য

চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের কীভাবে বহাল রাখা যায় তার জন্যে কিছু পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ৭ এপ্রিল, নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিচ্যুত শিক্ষক- শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘যাঁরা যোগ্য, তাঁদের চাকরি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের’। এবং তার জন্য সরকার প্ল্যান ‘বি’, প্ল্যান ‘সি’, প্ল্যান ‘ডি’ এবং প্ল্যান ‘ই’, তৈরি রেখেছে। সন্দেহ নেই সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর, তাই পরিকল্পনাও ছিল একাধিক।

একটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে তার জায়গা নেবে পরবর্তী পরিকল্পনা। অর্থাৎ প্ল্যান ‘এ’ তৈরি করার সময় ধরেই নেওয়া হয়েছে পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হতে পারে। সেক্ষেত্রে তার স্থান নেবে প্ল্যান ‘বি’। আবার প্ল্যান ‘বি’ ব্যর্থ হলে তার স্থান নেবে প্ল্যান ‘সি’। এইভাবে প্ল্যান ‘এ’ থেকে শুরু করে প্ল্যান ‘ডি’ পর্যন্ত পরিকল্পনাগুলির ভবিষ্যৎ ভালো নয় অনুমান করেই তৈরি রাখা হয়েছে প্ল্যান ‘ই’-কে। যদিও পরিকল্পনাগুলি কী, সে বিষয়ে সরকার কিছু স্পষ্ট করে বলেনি, তাই এ-বিষয়ে বিশদ কিছু বলাও মুশকিল।

যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে অনুমান করা গিয়েছিল যে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের স্বপদে বহাল রাখতে প্ল্যান ‘ই’ ছিল শেষ ভরসা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তাঁদের একাংশ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকতে পারলেও তারপর নতুন করে পরীক্ষা দিয়েই ফিরে আসতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই তিনি চাকরি পাবেন। পরীক্ষায় বসতে পারা মানেই চাকরির গ্যারান্টি নয়। কেউ কেউ সন্দেহ করছেন, যা হয়েছে, যা হচ্ছে, যা হবে— সবই মুখ্যমন্ত্রীর প্ল্যান ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’, ‘ডি’, ‘ই’ অনুযায়ী। বাকি সব নিমিত্ত মাত্র। ঘটনা প্রবাহ দেখে মনে হয় সন্দেহটা একেবারে অমূলক নয়। কারণ নেত্রীর সকল অভিসন্ধি পূর্ব থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়।

চাকরি বজায় রাখতে আন্দোলনের পথে গেলে তার পরিণতি কী হতে পারে তার নমুনা শিক্ষকসমাজ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। পেটের টানে রাস্তায় নেমে আসা শিক্ষকের বুকের উপরেও লাথি উঠে এসেছিল। হীরক রাজ্যে প্রতিবাদী মুখগুলোকে শায়েস্তা করার নানারকম ফন্দিফিকির ছিল। তাকেও লজ্জা দিয়েছিল ৯ এপ্রিল কসবার রাজপথ। শিক্ষার্থীরাও টিভির পর্দায় দেখেছিল প্রশাসনের দৃষ্টিতে তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্থান কোথায়!

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর চাকরিহারাদের ‘সার্ভিস ব্রেক’ ছাড়াই স্বপদে বহাল রাখার পরিকল্পনা একেবারেই নির্মূল হয়ে গেল বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। এই রায়ের ফলে সুপ্রিম কোর্টের আগের রায় যেন আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হলো। চাকরিহারা শিক্ষক- শিক্ষিকাদের অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, শেষ প্ল্যানের মাধ্যমে সরকার হয়তো বিদ্যালয়গুলিতে সিভিক পদ তৈরি করে সেই জায়গায় তাদের নিযুক্ত করবে। সেক্ষেত্রে তাদের খেয়েপরে বেঁচে থাকার একটা সংস্থান হবে ঠিকই কিন্তু আত্মসম্মানের সঙ্গে শিক্ষকতা করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো শিক্ষার্থীরা তাঁদের কীভাবে গ্রহণ করত তার উপর নির্ভর করবে পাঠাদানের সাফল্য। টিচার্সরুমে তাঁরা অন্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের শিকার হবেন কিনা সে প্রশ্নও উঠে আসা স্বাভাবিক। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন যোগ্য প্রার্থীরা। যোগ্য-অযোগ্য পৃথক করতে না পারার জন্যে যোগ্য শিক্ষকদেরও অযোগ্যের লেভেল নিয়ে সরে যেতে হলো। এর চেয়ে অমর্যাদাকর বিষয় একজন যোগ্য শিক্ষকের জীবনে আর কী হতে পারে? সমগ্র শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে ক্যামোফ্লাজ ও কারচুপির ফলে কারা যোগ্য আর কারা অযোগ্য, তা বাছাই করা তদন্তকারী সংস্থার পক্ষেও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। যোগ্য-অযোগ্য যাচাই ও চিহ্নিতকরণের জন্যে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্যই সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। যোগ্য-অযোগ্য পৃথক করা আর চোনা মেশানো দুধ থেকে চোনা পৃথক করা, একইরকম অসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে কোর্টের অভিমত ছিল। যার ফলে যোগ্য শিক্ষকদের কপালেও শাস্তির খাঁড়া নেমে এল।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দৃশ্যপট থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল। সেটা হলো অযোগ্যদের জায়গা দেওয়ার জন্যে যে সকল যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করা হয়েছিল তাঁদের কথা। যাঁরা প্রকাশ্য রাজপথে নিজের মস্তক মুণ্ডন করে তাঁদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন। তবুও সমস্যার সমাধান অধরাই ছিল। এই আবহে তাঁদের দাবি যেন আরও ক্ষীণ হয়ে গেল। আশার আলো যেটুকু রইল তা হলো আবার পরীক্ষায় বসার সুযোগ। আবারও একবার নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ। কিন্তু আবার শক্ত পরীক্ষা দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা তো চাট্টিখানি কথা নয়! সেই শক্তি কি চাকরিহারাদের অবশিষ্ট থাকবে? নাকি হাতে শুধু পেন্সিলটাই থাকবে? □

যোগ্য-অযোগ্য পৃথক করতে না পারার জন্যে যোগ্য শিক্ষকদেরও অযোগ্যের লেভেল নিয়ে সরে যেতে হলো। এর চেয়ে অমর্যাদাকর বিষয় একজন যোগ্য শিক্ষকের জীবনে আর কী হতে পারে?